অংশ বিশেষ এবং ইবাদত। উপরোক্ত সাহাবীরা শুধু জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন নি। কেননা, তাঁরা যদি এ মাল আহরণে অংশগ্রহণ নাও করতেন, তবুও শরীয়তের আইন অনুযায়ী তাঁরা ঐ অংশই পেতেন, যা অংশ-গ্রহণের পর পেয়েছেন। কাজেই তাঁরা জাগতিক লোভ-লালসার কারণে স্থান ত্যাগ করেছিলেন—একথা বলা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত আয়াতের তফসীরেও বলা হয়েছে যে, বড়দের সামান্য বিচ্যুতিকেই অনেক বড় মনে করা হয়। মামুলী অপরাধকে কঠোর অপরাধ গণ্য করে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গনীমতের মাল আহরণ করার সাথে কিছু না কিছু জাগতিক ফায়দার সম্পর্ক অবশ্য ছিল। এ সম্পর্কের মন্দ প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কাজেই সাহাবায়ে-কিরামের চারিত্রিক মানকে সমুন্নত রাখার জন্য তাঁদের এ কার্যকে 'দুনিয়া কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে জাগতিক লালসার সামান্য ধূলিকণাও তাঁদের অন্তরে স্থান লাভ করতে না পারে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ
اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ
ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

(১৪৬) আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহ্‌র পথে—তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭) তারা আর কিছুই বলেনি--শুধু বলেছে--হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। (১৪৮) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখিরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ওহুদ যুদ্ধে সংঘটিত কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে মুসলমানদের হুঁশিয়ার ও তিরস্কার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহেও এর

পরিশিষ্ট হিসাবে পূর্ববর্তী উম্মতদের কিছু কিছু অবস্থা ও ঘটনার দিকে ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অনড় ও অটল রয়েছে, তোমাদেরও তেমনি থাকা উচিত।

কিছু শব্দার্থের ব্যাখ্যা ঃ رِبِّيُّونَ শব্দটি رَبٌّ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর অর্থ 'রব্ব-ওয়ালা' অর্থাৎ আল্লাহ্-ভক্ত। কারও কারও মতে رِبِّيُّونَ শব্দের অর্থ অনেকগুলো দল। তাদের মত একটি رِبَّةٌ (দল) অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখানে رِبِّيُّونَ আল্লাহ্র ভক্ত বলে কাদের বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এঁরা হলেন আলিম ও ফিকহ্বিদ। (রূহুল-মা'আনী) اسْتَكَانُوا শব্দটি اسْتَكَانَةٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অপারক হয়ে বসে পড়া। وَهْنٌ থেকে উদ্ভূত হল وَهَنُوا অর্থ দুর্বলতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনেক নবী ছিলেন, যাঁদের অনুবর্তী হয়ে অনেক আল্লাহ্ভক্ত (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়েছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্র পথে সংঘটিত বিপদাপদের কারণে সাহস হারান নি; তাঁরা (দেহ ও মনের দিক দিয়ে) দুর্বল হন নি এবং তাঁরা (শত্রুর সামনে) নত হন নি (যে অপারকতা বা খোশামোদের কথাবার্তা বলা শুরু করবেন)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন দৃঢ়চেতা লোকদের ভালবাসেন। (কাজে কর্মে তারা কি ভুল করবে?) তাদের মুখ থেকে এ কথা ছাড়া কিছুই বের হয়নি (যে, তারা আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন ঃ) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের অপরাধ ও আমাদের কর্মের বাড়াবাড়ি ক্ষমা কর এবং (কাফিরদের বিরুদ্ধে) আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী কর। (এ দৃঢ়তা ও দোয়ার বরকতে) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পার্থিব পুরস্কার বিজয় ও সাফল্য দান করলেন এবং পরকালের উত্তম প্রতিদান দিলেন (অর্থাৎ সন্তুষ্টি ও জান্নাত)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আল্লাহ্-ভক্তদের দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর তাদের একটি বিরাট গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এ অপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কয়েকটি দোয়া করতেন ঃ

এক—আমাদের বিগত অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। দুই—বর্তমান জিহাদকালে

আমরা যেসব ত্রুটি করেছি, তা মার্জনা করুন! তিন---আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন। চার---শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন।

এসব দোয়ায় মুসলমানদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে।

নিজেদের সৎ কাজের জন্য গর্ব করা উচিত নয়ঃ প্রথম এই যে, সত্যধর্মী মু'মিন ব্যক্তি যত বড় সৎকর্মই করুক এবং আল্লাহ্‌র পথে যত কর্মতৎপরতাই প্রদর্শন করুক, সৎকর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। কারণ, তার সৎকর্মও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপারই ফলশ্রুতি। এ কৃপা ব্যতীত কোন সৎকর্ম হওয়াই সম্ভব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

فــوالله لولا الله ما اهتد ينا ولا تصد قنا ولا صلينا—আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপা না হলে আমরা সরল পথপ্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা যাকাত ও নামায আদায় করতে পারতাম না।

এতদ্ব্যতীত মানুষ যে সৎকর্ম করে, তা যতই সঠিকভাবে করুক না কেন, আল্লাহ্‌র শানের উপযুক্ত করে সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তাই কর্ম সম্পাদনের সময়ও মাগফিরাতের দোয়া করা প্রয়োজন।

এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে মানুষ যে সৎকর্ম করছে ভবিষ্যতেও তা করার সামর্থ্য হবে, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কাজেই বর্তমান কর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতেও এর ওপর কায়েম থাকার দোয়া মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা হওয়া দরকার।

উল্লিখিত দোয়াসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম অতীত গোনাহ্ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষ যেসব দুঃখ-কষ্ট অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তা অধিকাংশই তার বিগত গোনাহ্‌র ফল এবং এর প্রতিকার হচ্ছে ইস্তেগফার ও তওবা। মওলানা রূমী বলেনঃ

غـم چـو بینی زود استغفار کـن
غـم با مـر خالـق آمـد کار کـن

সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহ্‌ভক্তদের ইহকাল ও পরকাল—উভয় ক্ষেত্রে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহকালেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে বিজয় এবং উদ্দেশ্যে সাফল্য দান করেন এবং পরকালেও চিরস্থায়ী শান্তি দান করবেন---যার ক্ষয় নেই। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই حسن শব্দটি যোগ করে وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ বলা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ

فَتَنْقَلِبُوا خٰسِرِيْنَ ۝ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ۝

(১৪৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের কথা শোন, তাহলে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। (১৫০) বরং আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।

যোগসূত্র ঃ ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের গুজব ছড়িয়ে পড়তেই মুনাফিকরা দুষ্কৃতির সুযোগ পেয়ে বসে। তারা মুসলমানদের বলতে লাগলো যে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) নেই, তখন আমরা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে যাই না কেন ? এতে সব বিবাদ-বিসংবাদ মিটে যাবে। এ উক্তি থেকে মুনাফিকদের দুষ্টামি ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ফুটে উঠেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা এসব শত্রুদের কথায় ক্রুর্ণপাত করবে না, তাদের কোন পরামর্শে শরীক করবে না এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজও করবে না। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আল্লাহ্ভক্তদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতেও তেমনি মুনাফিক তথা ইসলামের শত্রুদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা কাফিরদের কথা মান্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে (কুফরের দিকে) পশ্চাৎপদে ফিরিয়ে দেবে। (অর্থাৎ তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মচ্যুত করা এবং ধর্মের প্রতি তাদের মনে কুধারণা সৃষ্টি করা। মাঝে মাঝে একথা তারা পরিষ্কার বলেও ফেলে এবং মাঝে মাঝে পরিষ্কার না বললেও এমন কৌশল অবলম্বন করে, যাতে আস্তে আস্তে মুসলমানদের মন থেকে ইসলামের মহত্ত্ব ও ভালোবাসা লোপ পেতে থাকে)। এতে তোমরা সর্বতোভাবে অকৃতকার্য হয়ে যাবে। (মোট কথা বন্ধুত্ব প্রকাশ করলেও তারা কখনই তোমাদের বন্ধু নয়) বরং আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের বন্ধু এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী। (এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের ওপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত। শত্রুরা যদি তোমাদের সাহায্যের কিছু পন্থা বলে, তবে আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশের বিপরীতে তা কার্যে পরিণত করো না)!

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ۝
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ

وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ
مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ
عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

(১৫১) এখন আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, তারা যাকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করেছে সে সম্পর্কে কোন সনদ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর তাদের ঠিকানা হলো দোযখের আগুন। বস্তুত জালিমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (১৫২) আর আল্লাহ্ সেই ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যা আপনার সাথে ছিল—যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে তাদেরকে খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করেছ এবং কাজ নিয়ে বিবাদ করেছ আর তোমাদের খুশীর বস্তু দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর তোমাদের কারো কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন তাদের উপর থেকে, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। বস্তুত তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে রয়েছে আল্লাহ্‌র কৃপা।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সাহায্যকারী। আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহায্যের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এখনই কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি, যেহেতু তারা এমন এক বস্তুকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করেছে, যার (অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রমাণ অবতরণ করেন নি (অর্থাৎ শরীয়তে গ্রাহ্য এমন কোন শব্দগত অথবা অর্থগত প্রমাণ অবতরণ করেন নি। সমুদয় যুক্তিগত প্রমাণ এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও প্রত্যেক মূর্খ ও কাফির কোন-না-কোন প্রমাণ উপস্থিত করে; কোন ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তাদের কাছে নেই)। জাহান্নাম তাদের বাসস্থান। এটা জালিমদের জন্য খুবই মন্দ বাসস্থান। (আয়াতে কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করার ওয়াদাটি এভাবে প্রকাশ পায় যে, প্রথমত মুসলমানদের পরাজয় সত্ত্বেও কাফিররা বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে---বায়যাভী)। অতঃপর কিছুদূর যাওয়ার পর তারা বুঝতে পারে যে, মৃতপ্রায় মুসলমানদের মরণ পর্ব শেষ না করে চলে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। এই মনে করে আবার মদীনার দিকে ধাবিত হওয়ার ইচ্ছা করতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা মদীনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে।

কাফিররা জনৈক গ্রাম্য পথিককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বললো ঃ তুমি মদীনায় পৌঁছে মুসলমানদের ভয় প্রদর্শন করো যে, মক্কাবাসীরা আবার মদীনার পথে অগ্রসর হচ্ছে! মহানবী (সা) ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা জানতে পেরে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে 'হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু শত্রু সৈন্য পূর্বেই পলায়ন করেছিল। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

পরবর্তী আয়াতে ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও পরাজয়ের কারণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় (সাহায্যের) অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করে দেখালেন—যখন তোমরা (যুদ্ধের প্রথমাবস্থায়) তাঁর আদেশে কাফিরদের হত্যা করছিল (তোমাদের এ চাপ আস্তে আস্তে বেড়েই চলত) যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই (অভিমতে) দুর্বল হয়ে পড়তে, (এভাবে যে, পেছনের রক্ষাব্যূহে পঞ্চাশ জন সিপাহী ও অধিনায়ককে নিযুক্ত করে রসূলুল্লাহ [সা] যে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা ভুল বোঝাবুঝিবশত তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে। কেউ কেউ মনে করছিল যে, আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। শত্রুদের মোকাবিলায় সবার সাথে অংশ গ্রহণ করা উচিত)। পরস্পর রসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ সম্পর্কে মতবিরোধ করতে লাগলে (কেউ কেউ সেখানেই অবস্থানের নির্দেশে অটল ছিল এবং কেউ কেউ অন্য প্রস্তাব উত্থাপন করল। এ অন্য প্রস্তাবের কারণেই ভর্ৎসনা করা হচ্ছে—) এবং তোমরা [রসূল (সা)-এর] কথামত চললে না, তোমাদের মনোবাঞ্ছা (চোখের সামনে) দেখিয়ে দেওয়ার পর (অর্থাৎ মুসলমানদের বিজয় দেখানো হয়েছিল)। তখন তোমাদের অবস্থা ছিল এই (যে,) তোমাদের কেউ কেউ ইহকালের সামগ্রী কামনা করছিল (অর্থাৎ শত্রু—সৈন্য হটিয়ে দিয়ে গনীমতের মাল আহরণ করতে চেয়েছিল) এবং কেউ কেউ (শুধু) পরকাল কামনা করছিল। (কিছু সংখ্যক মুসলমানের পক্ষ থেকে অভিমতের দুর্বলতা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের বিপরীতে ভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করা, তাঁর কথামত না চলা, ইহকালের সামগ্রী কামনা করা ইত্যাকার পাপসমূহ প্রকাশ পাওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যতের জন্য সাহায্য বন্ধ করে দেন)। অতঃপর তিনি কাফিরদের (বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া) থেকে তোমাদের বিরত রাখেন। (যদিও এ সাময়িক পরাজয় তোমাদের কর্মেরই ফল, তথাপি এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাজা হিসাবে নয় বরং এ কারণে হয়,) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (ঈমান) পরীক্ষা করেন। (সেমতে এ সময়ই মুনাফিক অর্থাৎ কপট বিশ্বাসী মুসলমানদের কপটতা ফুটে উঠে এবং খাঁটি মুসলমানদের মূল্য বেড়ে যায়)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করেছেন (এজন্য পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে না) এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের (অবস্থার) প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্র কাছে সাহাবায়ে-কিরামের উচ্চ মর্তবা ঃ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ওহুদ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবীর মতামত ভ্রান্ত ছিল! এ কারণে পূর্ববর্তী অনেক আয়াতে হুঁশিয়ারী

উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতসব অসন্তোষ প্রকাশ ও হুঁশিয়ারির মধ্যেও সাহাবায়ে-কিরামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ দর্শনীয়। প্রথমত لِيَبْتَلِيَكُمْ বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি সাজা হিসাবে নয়, বরং পরীক্ষার জন্য। অতঃপর وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ বলে পরিষ্কার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে-কিরাম তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল ইহকাল কামনা করছিলেন এবং একদল শুধু পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন্ কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে? এটা জানা কথা যে, গনীমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই 'ইহকাল কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তাঁরা স্বীয় রক্ষাব্যূহেই থেকে যেতেন এবং গনীমতের মাল আহরণে অংশগ্রহণ না করতেন, তবে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পেত? কিংবা অংশগ্রহণের ফলে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ বেড়ে গেছে? কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, গনীমতের আইন যাদের জানা আছে, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মাল আহরণে শরীক হওয়া ও রক্ষাব্যূহে অবস্থান করা—উভয় অবস্থাতেই তাঁরা সমান অংশ পেতেন।

এতে বোঝা যায় যে, তাঁদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে পারে না; বরং একে জিহাদের কাজেই অংশগ্রহণ বলা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে তখন গনীমতের মালের কল্পনা অন্তরে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র দেখতে চান। এ কারণে একেই 'ইহকাল কামনা' রূপে ব্যক্ত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَّ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيٓ
أُخْرٰىكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ
أَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ
الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ
أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ

هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۗ يُخْفُوْنَ
فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۗ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ
شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۗ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٥٥﴾

(১৫৩) আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রসূল তোমাদের ডাকছিলেন তোমাদের পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের উপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ্ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন। (১৫৪) অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমুচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মত। তারা বলছিল—আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সব কিছুই আল্লাহ্র হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে—তোমার নিকট প্রকাশ করে না, সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবে তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসতো নিজেদের অবস্থান থেকে, যাদের মৃত্যু লিখে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ্ মনের গোপন বিষয় জানেন। (১৫৫) তোমাদের যে দু'টি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল—শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল তাদেরই পাপের দরুন।

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াতে এ অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে সাহাবায়ে কিরামের দুঃখ ও মানসিক ক্লেশের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় দীর্ঘ আয়াতেও দুঃখ দূরীকরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে পুনরায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোনরূপ সাজা হিসাবে এ বিপর্যয় নেমে আসেনি; বরং এটি ছিল খাঁটি ঈমানদার ও কপট বিশ্বাসীদের মধ্যে

পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে একটি পরীক্ষা। উপসংহারে সাহাবায়ে-কিরামের ত্রুটির পৌনঃপুনিক ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্মরণ কর, যখন তোমরা (পলায়নরত অবস্থায় রণভূমিতে) আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং কাউকে পেছন ফিরে দেখছিলে না এবং রসূল (সা) পশ্চাদ্দিক থেকে তোমাদের আহ্বান করছিলেন (যে এদিকে এস, এদিকে এস। কিন্তু তোমরা শুনছিলে না)। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তোমাদের দুঃখ দিলেন। (রসূল [সা]-কে তোমাদের) দুঃখ দেওয়ার কারণে---যাতে (এ প্রতিদান ও বিপদ দ্বারা তোমাদের মধ্যে পরিপক্কতা সৃষ্টি হয়---যার ফলে পুনরায়) তোমরা দুঃখিত না হও যা হস্তচ্যুত হয়ে গেছে, তজ্জন্য এবং যা বিপদ উপনীত হয়েছে, তজ্জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (এ কারণে তোমরা যেরূপ কর্ম কর, তিনি তার উপযুক্ত প্রতিদান দেন। পরবর্তী আয়াতে দুঃখ দূর করার কথা বলা হচ্ছে), অতঃপর তিনি এ দুঃখের পর তোমাদের প্রতি শান্তি (ও আরাম) প্রেরণ করলেন। অর্থাৎ তন্দ্রা---(কাফিররা ময়দান ত্যাগ করে চলে গেলে অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে মুসলমানরা তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। ফলে তাদের দুঃখ-ক্লান্তি সব দূর হয়ে যায়।) যা তোমাদের একদল (অর্থাৎ মুসলমানদের)-কে আচ্ছন্ন করছিল, আর একদল (অর্থাৎ মুনাফিকরা) নিজের জীবন নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল (যে, দেখা যাক, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে যাওয়া যায় কি না)। তারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে অবান্তর ধারণা পোষণ করছিল---যা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা প্রসূত। (তাদের এ ধারণা তাদের পরবর্তী উক্তি থেকে এবং তা যে নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত তা এর জবাব থেকে জানা যায়। তাদের উক্তি ছিল এই) তারা বলছিল ঃ আমাদের হাতে কোন ক্ষমতা আছে কি? (অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে আমরা যে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তা কেউ শুনল না। মিছামিছি সবাইকে বিপদে ফেলে দিয়েছে।) আপনি বলে দিন ঃ ক্ষমতা তো সবই আল্লাহ্র। (অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ মত কাজ করলেও আল্লাহ্র ফয়সালাই ঊর্ধ্বে থাকতো এবং বিপদাপদ যা আসার, অবশ্যই আসতো। পরবর্তী আয়াতে তাদের উক্তি ও তার জবাব সবিস্তারে বর্ণিত হচ্ছে)। তারা অন্তরে এমন বিষয় গোপন রাখে, যা আপনার কাছে (স্পষ্ট করে) প্রকাশ করে না। (কেননা, "আমাদের কি ক্ষমতা আছে?"---তাদের এ উক্তির বাহ্যিক অর্থ এরূপ বোঝা যায় যে, তকদীরের মুকাবিলায় মানুষের চেষ্টা-চরিত্র অচল। এটা সাক্ষাত ঈমানের কথা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও এ অর্থ সমর্থন করে সূক্ষ্ম জবাব দেওয়া হয়েছে যে, বাস্তবিক আল্লাহ্র ক্ষমতাই সব কিছুর ওপর প্রবল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উক্তির উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না। তারা এ উক্তিটি এই অর্থে) বলে যে, যদি আমাদের কিছু ক্ষমতা থাকত (অর্থাৎ আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হতো) তবে আমরা (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা এখানে নিহত হয়েছে, তারা) এখানে নিহত হতাম না। (এ কথার সারমর্ম এই যে, বিধিলিপি কিছুই না। এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে তাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে) আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা তোমাদের

গৃহেও থাকতে, তবুও যাদের বিধিলিপিতে হত্যা অবধারিত ছিল, তারা এসব স্থানের পানে (আসার জন্য) বের হয়ে পড়তো, যেখানে তারা (নিহত হয়ে হয়ে) শায়িত আছে। (উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক ক্ষতি যা হয়েছে, তা অবশ্যই হতো। একে টলানো সম্ভবপর ছিল না। এর উপকারিতা ছিল বিরাট। কেননা,) যা কিছু হয়েছে, তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরের বিষয় (অর্থাৎ ঈমান) পরীক্ষা করেন (কেননা, এ বিপদ মুহূর্তে মুনাফিকদের কপটতা ফুটে ওঠে এবং মু'মিনদের ঈমান আরও শক্ত ও সপ্রমাণিত হয়ে যায়) এবং তোমাদের হৃদয়ে যা আছে, তাকে (অর্থাৎ-এ ঈমানকেই মালিন্য ও কুমন্ত্রণা থেকে) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন। (কেননা, বিপদের সময় মু'মিন ব্যক্তির দৃষ্টি সব কিছু থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্র দিকে নিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ঈমান ঔজ্জ্বল্য ও শক্তিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে খুব ভালো-ভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। (তাঁর পক্ষে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আদালতের নিয়মে অপরাধীর অপরাধ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়)। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দুই দলের (মুসলমান ও কাফিরের) পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার দিন (অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পশ্চাৎবর্তী হয়েছিল, (এর কারণ) এ ছাড়া কিছুই হয়নি যে, শয়তান তাদের কতক (অতীত) কর্মের কারণে তাদের বিচ্যুত করেছে। (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে গিয়েছিল, যদ্দরুন শয়তানের মধ্যে তাদের দ্বারা আরও আদেশ অমান্য করানোর লালসা জেগে ওঠে এবং ঘটনাচক্রে সে লালসা চরিতার্থ হয়ে যায়)। নিশ্চয় জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বাস্তবিক আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অত্যন্ত সহনশীল (ত্রুটি সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাজা দেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে কিছু সংখ্যক সাহাবীর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়া এবং স্বয়ং হুযুরে আকরাম (সা.) কর্তৃক আহ্বান করার পরও ফিরে না আসা আর সেজন্য হুযুরের দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে-কিরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.)-এর ডাকে সাহাবীগণ পুনরায় সমবেত হয়েছিলেন।

তফসীরে রূহুল-মা'আনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, প্রথমে রসূলে করীম (সা) আহ্বান করেন, যা সাহাবায়ে-কিরাম শুনতে পান নি এবং তাঁরা বহু দূরে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.)-এর ডাক শুনতে পেয়ে সবাই এসে সমবেত হন।

তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে হযরত হাকীমুল-উম্মত বলেন, (সাহাবীগণের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার) মূল কারণ ছিল হুযুর আকরাম (সা)-এর শাহাদতের সংবাদ। পক্ষান্তরে হুযুর যখন ডাকলেন তখন তাতে একে তো এ দুঃসংবাদের কোন খণ্ডন ছিল না, তদুপরি আওয়াজ যদি পৌঁছেও থাকে, তাঁরা তা চিন্‌তে পারেন নি। তারপর যখন

হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা) ডাকেন তখন তাতে সে সংবাদের খণ্ডন এবং সাথে সাথে হুযুর (সা)-এর বেঁচে থাকার কথাও বলা হয়েছিল। কাজেই এ-কথা শুনে সবাই শান্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা এলো কেন এবং রসূলে করীম (স.) দুঃখিত হলেন কেন? তার কারণ এই হতে পারে যে, সাহাবায়ে-কিরাম যদি সে সময়টায় মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে হুযুরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন।

ওহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ

—আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ এসেছিল এবং সাহাবায়ে কিরামের উপর যে মুসীবত এসে পতিত হয়েছিল, তা শাস্তি হিসাবে নয়, পরীক্ষা হিসাবে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মু'মিন এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর أَثَابَكُمْ غَمًّا বাক্যের দ্বারা যে শাস্তির কথা বোঝা যায়, তার ব্যাখ্যা এই যে, এর প্রকৃত রূপটি ছিল শাস্তির মতই, কিন্তু এই শাস্তিটি যে অভিভাবকসুলভ এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ট। যে কোন পিতা তার পুত্রকে এবং ওস্তাদ তাঁর শাগরিদকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও প্রচলিত পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলভ শাস্তি থেকে ভিন্নতর।

ওহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণঃ উল্লিখিত বাক্য لِيَبْتَلِيَكُمْ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তাতে তো একথাই বোঝা যায় যে, এসব বিপদের কারণ ছিল একান্তই আল্লাহ্র ইচ্ছা, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا—বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, সেই সাহাবীদের পূর্ববর্তী কোন কোন পদস্খলনই এই প্রতিক্রিয়ার কারণ।

এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সেই পদস্খলনই ছিল, যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেওয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায়। কিন্তু এই পদস্খলন এবং তার পশ্চাৎবর্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই মৌলিক তাৎপর্য— لِيَبْتَلِيَكُمْ বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল-মা'আনী গ্রন্থে যুযাজ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, শয়তান তাঁদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তাঁরা জিহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় জিহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারেন।

এক পাপও অপর পাপের কারণ হতে পারে ঃ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে টেনে আনে। যেমন একটি পুণ্য আরেকটি পুণ্যকে টেনে আনে; অর্থাৎ পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যখন কোন একটা পুণ্য বা নেকী সম্পাদন করে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তখন তার পক্ষে অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। তার মনে নেক কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মানুষ যখন কোন পাপ কার্য সম্পাদন করে ফেলে তখন তা অন্যান্য পাপের পথও সুগম করে দেয়; মনের মধ্যে পাপের আগ্রহ বেড়ে যায়। সেজন্যই কোন কোন বুযুর্গ মনীষী বলেছেন ঃ

انّ من جزاء الحسنة الحسنة بعدها وان من جزاء السّيئة السيئة بعدها ٥

অর্থাৎ নেক কাজের একটা নগদ প্রতিদান হলো পরে অন্তত আরও একটি নেকী করার সামর্থ্য লাভ করা যায়। আর মন্দ ও পাপ কাজের একটি শাস্তি হলো সেই পাপের পর আরো পাপের পথ সুগম হয়ে পড়ে।

হাকীমুল উম্মত (র) 'মাসায়েলুস সুলুক' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীসের বিবরণ অনুসারে পাপের ফলে অন্তরে একটি অন্ধকার ও কালিমার জন্ম হয়। আর অন্তরে যখন কালিমা ও অন্ধকার উপস্থিত হয়, তখন শয়তান তাকে পরাজিত করে ফেলে।

আল্লাহ্‌র নিকট সাহাবায়ে-কিরামের মর্যাদা ঃ ওহুদের ঘটনায় কোন কোন সাহাবীর দ্বারা যেসব পদস্খলন ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, তা সেক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন ও বিরাট ছিল। পঞ্চাশ জন সাহাবীকে যে অবস্থানে সেখান থেকে না সরার নির্দেশ দিয়ে বসানো হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশ সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। এই সরে পড়ার পেছনে যদিও তাঁদের এই ধারণা কার্যকর ছিল যে, এখন বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং এই নির্দেশও সম্পাদিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন নিচে নেমে গিয়ে মুসলমানদের সাথে মেশা কর্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মহানবী (সা)-র পরিষ্কার হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণই ছিল। এই অন্যায় ও ত্রুটির ফলেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভুলটি সংঘটিত হয়; যদিও এ ব্যাপারেও কোন কোন বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন যুযাজ থেকে ওপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এমন এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন রসূলে করীম (স) স্বয়ং তাদের সাথে রয়েছেন এবং পেছন থেকে তাদেরকে ডাকছেন। এসব বিষয়কে যদি ব্যক্তিত্ব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পৃথক করে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা এত কঠিন ও ভয়ানক অপরাধ ছিল যে, সাহাবীগণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যেসব অপবাদ আরোপ করে থাকে, এটা সে সব অপবাদের মধ্যকার কঠিন অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন সত্ত্বেও এদের সাথে কি আচরণ করেছেন ? উল্লিখিত আয়াতে সে প্রসঙ্গটিই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক নিয়ামত তন্দ্রা অবতরণ করে তাদের ক্লান্তি শ্রান্তি ও হতাশা দূর

করে দেওয়া। তারপর বলে দেওয়া হয় যে, তখন মুসলমানদের ওপর যে বিপদ এসেছিল, তা শাস্তি কিংবা আযাব ছিল না; বরং তাতে কিছুটা অভিভাবকসুলভ শাসনের লক্ষ্যও নিহিত ছিল। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

এসব বিষয় ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে এবং এখানে আবার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। এই পুনরাবৃত্তির একটি তাৎপর্য হলো এই যে, প্রথমবারে সাহাবায়ে-কিরামের সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে আর এখানে উদ্দেশ্য হলো মুনাফিকদের সে উক্তির খণ্ডন করা যে, তোমরা আমাদের মতানুসারে কাজ করনি বলেই এই বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

যা হোক, এই সমুদয় আয়াতে একান্ত পরিষ্কারভাবে সামনে এসে গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে স্বীয় রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর সঙ্গী-সাথিগণকে নৈকট্যের এমন এক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যাতে এহেন বিরাট অপরাধ এবং পদস্খলনসমূহ সত্ত্বেও তাঁদের সাথে শুধু ক্ষমাসুন্দর আচরণই নয়, বরং দয়া ও করুণাও প্রদর্শন করা হয়। এ তো গেল আল্লাহ্ তা'আলার এবং কোরআনের বর্ণনা। হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ (রা)-র এমনি ধরনের একটি বিষয় হুযূরে আকরাম (সা)-এর সামনে উপস্থাপিত হয়। তিনি মক্কার মুশরিকদেরকে মদীনার মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে একটি চিঠি লিখে-ছিলেন। হুযূরে আকরাম (সা) যখন ওহীযোগে এর সন্ধান জানতে পারেন এবং সে পত্রখানা ধরা পড়ে, তখন সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে কঠিন অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে। হযরত ফারূকে-আযম নিবেদন করলেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান নিয়ে নেব। কিন্তু রসূলে করীম (সা) জানতেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক নন, নিষ্ঠাবান মু'মিন। অবশ্য এ ভুলটি তাঁর দ্বারা হয়ে গেছে। কাজেই তিনি হাতেবকে ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন যে, ইনি আহ্লে-বদরদের একজন। আর আল্লাহ্ হয়তো সে সমস্তের ব্যাপারেই ক্ষমা ও মাগফিরাতের নির্দেশ জারি করে দিয়েছেন। এ রেওয়ায়েতটি হাদীসের সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিদ্যমান।

সাহাবায়ে-কিরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা ঃ এখান থেকেই আহ্লে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সেই আকীদা ও বিশ্বাসের সমর্থন হয় যে, যদিও সাহাবায়ে-কিরাম (রা) সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং হয়েছেও; কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মতের জন্য তাঁদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-ই যখন তাঁদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাঁদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদেরকে 'রাযিয়াল্লাহু আন্হুম ওয়া রাযু আন্হু'-এর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাঁদেরকে কোন প্রকার অশালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোন অধিকার অপর কারো কেমন করে থাকতে পারে?

সে জন্যই এক সময় কোন এক সাহাবী যখন হযরত উসমান (রা) ও অন্য কয়েক-জন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনাক্রমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর সামনে এই মর্মে মন্তব্য করলেন যে---এঁরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে

গিয়েছিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বললেন--আল্লাহ্ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অধিকার কারো নেই। ---(সহীহ বুখারী)

কাজেই আহ্লে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সমস্ত আকায়েদ গ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, সমস্ত সাহাবায়ে-কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তাঁদের প্রতি কটূক্তি থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। 'আকায়েদে-নসফিয়্যাহ্' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

ويكفّ عن ذكر الصّحابة الا بخير-

অর্থাৎ অশালীনভাবে সাহাবীগণকে স্মরণ না করা ওয়াজিব।

শরহে মুসামেরাহ ইবনে হুমামে উল্লেখ রয়েছে ঃ

اعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم

অর্থাৎ আহ্লে-সুন্নতের আকীদা হচ্ছে সাহাবীদের সকলকেই নির্ভরযোগ্য মনে করতে হবে এবং প্রশংসার সাথে তাঁদের উল্লেখ করতে হবে। শরহে-মাওয়াকিফ-এ রয়েছে ঃ

يجب تعظيم الصحابة كلّهم والكف عن القدح فيهم o

অর্থাৎ, "সকল সাহাবীর তা'যীম করা ওয়াজিব এবং তাঁদের সমালোচনা করা কিংবা কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন থেকে বিরত থাকাও ওয়াজিব।"

হাফেজ ইবনে তায়মিয়্যাহ্ (র) আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া গ্রন্থে বলেছেন ঃ

---"আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, ইতিহাসে যেসব রেওয়ায়েতে তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত, যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোন কোন ব্যাপার রয়েছে, যেগুলোতে কম-বেশী করে মূল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীদের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাঁদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুত ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালংঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হলো— ان الحسنات يذهبن السيئات

অর্থাৎ সৎ কাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফ্ফারা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, সাহাবায়ে-কিরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাঁদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাঁদের ব্যাপারে কটূক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই। —(আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ
إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟
وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْىِۦ وَ
يُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُّتُّمْ
أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

(১৫৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফির হয়েছে এবং নিজেদের ভাইয়েরা, যখন তারা ভ্রমণে বের হয় কিংবা জিহাদে লিপ্ত হয়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে তারা মরতও না, নিহতও হতো না! যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কাজেরই দ্রষ্টা। (১৫৭) আর তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যু বরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবের চেয়ে উত্তম। (১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার সামনেই সমবেত হবে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا অর্থাৎ "আমাদের যদি কোন ক্ষমতা থাকতো, কিংবা আমাদের মতামত যদি গ্রহণ করা হতো, তাহলে আমরা এখানে (এভাবে) নিহত হতাম না।" পরেও এই বিষয়টি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এমন ধরনের উক্তি শোনার কারণে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনেও কিছুটা দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। কাজেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ ধরনের উক্তি ও অবস্থা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং হায়াত-মওতের ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তি বা তকদীরের উপর ভরসা করার জন্য মুসলমানদের হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেই সমস্ত লোকের মত হয়ে যেও না, যারা (প্রকৃতপক্ষে) কাফির (অবশ্য বাহ্যিকভাবে মুসলমান হওয়ার দাবী করে থাকে) এবং নিজেদের (গোত্রীয়)

ভাইয়েরা যখন কোন ভূখণ্ডে সফর করতে যায় (আর ঘটনাচক্রে সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়) কিংবা কোথাও জিহাদে গমন করে এবং তকদীর অনুযায়ী নিহত হয় তখন সেই মুনাফিকরা বলে যে, এরা যদি আমাদের কাছে থাকতো; (সফর কিংবা যুদ্ধে না যেতো,) তাহলে মৃত্যুও বরণ করতো না, নিহতও হতো না। (একথা তাদের মনে এবং মুখে এজন্য আসতো) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটিকে তাদের অন্তরে অনুতাপের কারণ করে দেন (অর্থাৎ এ ধরনের উক্তির ফলে অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই হয় না)। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলাই মৃত্যু কিংবা জীবন দান করেন (তা সফরকালেই হোক অথবা ঘরে থাকাকালেই হোক, যুদ্ধের সময় হোক অথবা শান্তিকালে হোক) আর তোমরা যাই কিছু কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্তই দেখছেন (কাজেই তোমরাও যদি এ ধরনের কোন উক্তি কর কিংবা এ ধরনের কোন ধারণা মনে পোষণ কর, তবে তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোপন থাকে না)। আর যদি তোমরা আল্লাহ্র রাহে নিহত হও অথবা (আল্লাহ্র রাহে) মৃত্যুবরণ কর (তাহলে এটা কোন ক্ষতির বিষয় নয়) তাতে লাভই হয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে (সমগ্র পৃথিবীর) যে করুণা ও ক্ষমা রয়েছে সে সমস্ত বস্তুসামগ্রী অপেক্ষা (বহু গুণে) উত্তম, যেগুলো তারা সংগ্রহ করে চলেছে (এবং সেগুলোর লোভেই জীবনকে ভালবাসে। আর) তোমরা যদি (এমনিতেও) মরে যাও কিংবা নিহত হও (তবুও) নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র নিকট নীত হবে। (সুতরাং একে তো নির্ধারিত নিয়তির কোন রদবদল হয় না, আর দ্বিতীয়ত আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন থেকে কেউ অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। বস্তুত দীনের পথে মৃত্যুবরণ করা বা নিহত হওয়া হলো ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তির কারণ। কাজেই এমনিতে মরার চাইতে ধর্মের পথে আত্মদান করাই উত্তম। সে জন্যই এ ধরনের উক্তি দুনিয়ায় পরিতাপের বিষয় এবং আখিরাতে জাহান্নামের কারণ। এসব উক্তি থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

(১৫৯) আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন—আল্লাহ্ তাওয়াককুলকারীদের ভালবাসেন।

যোগসূত্র ঃ ওহুদ যুদ্ধে কোন কোন সাহাবীর যে পদস্খলন এবং তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার দরুন হুযূরে আকরাম (সা) অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন, যদিও

স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার দরুন তিনি সেজন্য সাহাবীগণের প্রতি কোন প্রকার ভৎর্সনা করেন নি এবং কোন রকম কঠোরতাও অবলম্বন করেন নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-এর সঙ্গী-সাথীদের এবং মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এই ভুলের দরুন তাঁদের মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল সে সমস্ত বিষয় ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে অধিকতর কোমলতা ও করুণা প্রদর্শনের হেদায়েত করা হয়েছে এবং কাজে-কর্মে সাহাবায়ে-কিরামের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সাহাবায়ে-কিরামের দ্বারা এমন পদস্খলন সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরে তাঁদেরকে ভৎর্সনা ও তিরস্কার করার অধিকার হুযুরে আকরাম [সা]-এর ছিল) আল্লাহ্র (সেই) রহমতের দরুন (যা তাঁর উপর রয়েছে) তিনি তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করলেন। আর (খোদা-নাখাস্তা) যদি তিনি কঠোর হতেন, তাহলে এরা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো (তখন তারা এই বরকত ও মহানুভবতা কেমন করে লাভ করতে পারতো)। কাজেই (আপনি যখন আচরণের বেলায় এমন কোমলতা অবলম্বন করেছেন, তখন তাদের দ্বারা আপনার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে যে ত্রুটি হয়ে গেছে, সেজন্য অন্তর থেকেও) তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনে তাদের যে ত্রুটি হয়েছে, সে জন্য) আপনি তাদের তরফ থেকে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বেই তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনার দোয়া করা তাদের পক্ষে অধিকতর উপকারী ও ফলপ্রদ হবে এবং তাদের মনস্তুষ্টির কারণ হবে)। আর বিশেষ বিষয়ে (যথারীতি) তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকুন (যাতে এই বিশেষ রহমতের দৌলতে তাদের মন থেকে দুঃখ-কষ্ট ধুয়ে যায়)। অতঃপর (পরামর্শ গ্রহণ করার পর) আপনি যখন (কোন একদিকে) মতামত সাব্যস্ত করে ফেলবেন (তা তাদের পরামর্শ অনুযায়ী হোক কিংবা পরিপন্থী হোক), তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা (করে সে কাজ) করে ফেলুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ ঃ যে সাহাবায়ে-কিরাম (রা) হুযুর আকরাম (সা)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যাঁরা তাঁকে নিজেদের জানমাল অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করতেন, তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যখন তাঁদের দ্বারা একটি পদস্খলন ঘটে যায়, তখন একদিকে নিজেদের পদস্খলন ও বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাঁদের অনুতাপ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা ছিল, যা তাঁদের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিতে পারতো কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ করে তুলতে পারতো। এরই প্রতিকারে পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ এই পদস্খলনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেয়া হয়ে গেছে ; আখিরাতের পাতা পরিষ্কার।

অপরদিকে এই ত্রুটি ও পদস্খলনের ফলে রসূল করীম (সা) আহত হয়ে পড়েন এবং দৈহিক কষ্টও হয়। আত্মিক কষ্ট তো পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। কাজেই দৈহিক ও আত্মিক কষ্টের কারণে সাহাবীদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ারও আশংকা বিদ্যমান ছিল, যা তাদের হেদায়েত ও দীক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারতে। সেজন্য মহানবী (সা)-কে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের পদস্খলন ও ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং ভবিষ্যতের জন্যও তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে থাকুন।

এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এক বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বিবৃত করেছেন, যাতে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এক---হুযূর আকরাম (সা)-কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এমন ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁর প্রশংসা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশও ঘটে যে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই আপনার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

দুই---এর আগে فَبِمَا رَحْمَةٍ শব্দটি বাড়িয়ে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই রহমতের ফল, কারো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়। তদুপরি 'রহমত' শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মহত্ত্ব ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধুমাত্র সাহাবায়ে-কিরামের জন্যই নয়, বরং স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-এর জন্যও রয়েছে। সে কারণেই আপনাকে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরবর্তী বাক্যগুলোর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই কোমলতা, সদ্ব্যবহার, ক্ষমা প্রদর্শন এবং দয়া ও করুণা করার গুণ যদি আপনার মধ্যে না থাকত, তবে মানুষের সংশোধনের যে দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করা হয়েছে তা যথাযথভাবে সম্পাদিত হতো না। মানুষ আপনার মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনের উপকারিতা লাভ করার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো।

এ সমস্ত বিষয়ের দ্বারা দীক্ষাদান, সংস্কার সাধন এবং ধর্ম প্রচারের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যে ব্যক্তি দীক্ষাদান, সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করবে, তাকে অপরিহার্যভাবে উল্লিখিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। এ ব্যাপারে যখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম রসূলের কঠোরতাই সহ্য করা হয়নি, তখন কোন প্রকার কঠোরতা বা চারিত্রিক

অনমনীয়তার মাধ্যমে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের সংস্কার ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে—এমন সাধ্য কার হতে পারে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন যে, আপনি যদি কঠোর-স্বভাব ও রূঢ় হতেন, তবে মানুষ আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন দীক্ষাদানকারী পীর ও ধর্ম প্রচারকের পক্ষে কঠোর প্রকৃতি ও রূঢ় ভাষী হওয়া একান্ত ক্ষতিকর এবং তার কাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর বলা হয়েছে-فَاعْفُ عَنْهُمْ অর্থাৎ তাদের দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেছে, আপনি তা ক্ষমা করে দিন। এতে বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং কেউ কোন রকম কষ্ট দিলে কিংবা মন্দ বললে তার প্রতি রাগ না করে কোমল ব্যবহার করাও একজন সংস্কারকের একান্ত কর্তব্য।

তারপর বলা হয়েছেঃ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ অর্থাৎ তাদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য শুধু নিজে সবরই করবেন না, বরং মনে প্রাণে তাদের কল্যাণ কামনাও পরিহার করবেন না। আর যেহেতু তাদের আখিরাতের সংশোধনই সবচেয়ে বড় সেহেতু তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে বাঁচাবার লক্ষ্যে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সবশেষে বলা হয়েছেঃ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন কাজে-কর্মে এবং কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, যাতে তাঁদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাঁদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

এই সমুদয় আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিহার করা। দ্বিতীয়ত, সাধারণ লোকদের দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা কষ্টদায়ক কোন বিষয় সংঘটিত হলে সেজন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা। তৃতীয়ত, তাদের পদস্খলন ও ভুল-ভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা। তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার পরিহার না করা। উল্লিখিত আয়াতে মহানবী (সা)-কে প্রথম তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে কোরআন করীম দু'জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান

করেছে। একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা শূরার সেই আয়াতে, যাতে সত্যিকার মুসলমানদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ সম্পর্কে এই বলা হয়েছে যে, أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ (যারা সত্যিকার মুসলমান) তাঁদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরামর্শ করার হেদায়েত প্রসঙ্গক্রমে দেওয়া হয়েছে। যেমন, রেযাআত বা সন্তানকে স্তন্যদান সম্পর্কিত আহ্কামে বলা হয়েছে ঃ عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ অর্থাৎ সন্তানের দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটি পিতা-মাতার সম্মতি ও পারস্পরিক পরামর্শক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরামর্শ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

এক— امر (আমর) ও مشورة (মুশওয়ারাহ্) শব্দের অর্থ ; দুই—মুশওয়ারাহ্ বা পরামর্শের শরীয়তসম্মত মান ; তিন—সাহাবায়ে-কিরামের নিকট থেকে রসূলে করীম (সা)-এর পরামর্শ গ্রহণের মান ; চার—ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের মান ; পাঁচ—পরামর্শে মতবিরোধ হলে তা মীমাংসার উপায় ; ছয়—যে কোন কাজে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের পর আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা।

প্রথম বিষয় আমর ও শূরার পর্যালোচনা ঃ আরবী ভাষায় 'আমর' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি ব্যাপক অর্থে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা ও কাজকে বোঝায়। দ্বিতীয় প্রয়োগ হয় নির্দেশ ও রাষ্ট্রীয় বিষয় অর্থে। এরই ভিত্তিতে কোরআন করীমে বলা হয়েছে أُولِي الْأَمْرِ- আর তৃতীয় প্রয়োগ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ অর্থে। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন ঃ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ - إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ - أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

আর তত্ত্বজ্ঞানী মনীষিগণের মতে قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي আয়াতেও এই 'আমর'ই উদ্দেশ্য। এছাড়া وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ এবং وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ আয়াতে উভয় অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত যদি বলা হয় যে, প্রথম অর্থটিই ধরে নেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থও এরই অন্তর্ভুক্ত, তবে তাও অসম্ভব নয়। কারণ সংবিধান ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এসব আয়াতে 'আমর' শব্দের অর্থ (সেই সব বিষয়, যাতে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে

তা সে বিষয়টি রাষ্ট্র সংক্রান্ত হোক কিংবা বৈষয়িক হোক। আর 'শূরা' অর্থ হলো পরামর্শ ও মন্ত্রণা। অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লোকদের মতামত গ্রহণ করা। সেজন্যই وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ আয়াতে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে---রাষ্ট্রীয় বিষয়ও যার অন্তর্ভুক্ত—সাহাবায়ে-কিরামের পরামর্শ গ্রহণ করুন অর্থাৎ তাঁদের মতামতও জেনে নিন।

এমনিভাবে সূরা শূরার وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ আয়াতের অর্থ হচ্ছে—যারা সত্যিকার মুসলমান তাঁদের চিরাচরিত স্বভাব হলো এই যে, তাঁরা যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে থাকেন, সে কাজ বিধি-বিধান ও রাষ্ট্র সংক্রান্তই হোক অথবা অন্য কোন বিষয়েই হোক।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ পরামর্শের শরীয়তসম্মত মানঃ কোরআন করীমের উল্লিখিত বক্তব্য এবং নবী করীম (সা)-এর বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন সব ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শ করে নেওয়া রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের রীতি এবং আখিরাতে নাজাতের কারণ, যাতে দ্বিমতের আশংকা রয়েছে। তা সে ব্যাপারটি শরীয়তের বিধান বা রাষ্ট্র সংক্রান্তই হোক কিংবা অন্য কোন বিষয়ই হোক। কোরআন-হাদীসেও এ ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে। আর যেসব রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সম্পর্ক জন-সাধারণের স্বার্থের সাথে জড়িত সে ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। ---(ইবনে-কাসীর)

ইমাম বায়হাকী 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোক কোন কাজ করার ইচ্ছা করে এবং পারস্পরিক পরামর্শ করার পর তার বাস্তবায়ন করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সঠিক ও লাভজনক দিকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, "তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি যখন তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিরা যখন সুখী বা দাতা হবে এবং তোমাদের জাতীয় ও সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহ যখন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে, তখন যমীনের ওপর থাকা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। পক্ষান্তরে তোমাদের শাসক যখন নিকৃষ্টতর ব্যক্তি হবে, তোমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিরা যখন বখিল বা কৃপণ হবে এবং তোমাদের বিষয়াদি যখন স্ত্রীলোকদের হাতে অর্পিত হবে, তখন মাটির ভেতরে সমাহিত হয়ে যাওয়া তোমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা অপেক্ষা উত্তম হবে।"

অর্থাৎ তোমাদের উপর যখন রিপুর আনুগত্য প্রবল হয়ে পড়বে, যাতে করে ভালমন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণকে উপেক্ষা করে শুধু রমণীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের বিষয়াদি তাদের হাতে অর্পণ করবে, তখন সে সময়ের জীবন অপেক্ষা তোমাদের জন্য মৃত্যুই উত্তম হবে। অবশ্য পরামর্শ করতে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মতামত নেওয়াতে কোন বাধা নেই। রসূলে করীম (সা) এবং সাহাবায়ে-কিরামের আচার-

আচরণের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে এবং সূরা বাক্বারার যে আয়াত ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ঃ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ শিশুর দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটি পিতা-মাতার পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত হওয়া উচিত। এতে বিষয়টি যেহেতু স্ত্রীলোকের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের সাথে পরামর্শ করার বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে।

এক হাদীসে মহানবী (সা)-র ইরশাদ রয়েছে ঃ

المستشار مؤتمن اذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه

অর্থাৎ "যার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয়, সে হলো আমানতদার। কাজেই সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অন্যকেও সে কাজেরই পরামর্শ দেওয়া তার পক্ষে ওয়াজিব। এর ব্যতিক্রম করা আমানতে খেয়ানত করার শামিল। এ হাদীসটি 'মু'জামে-আওসাত' গ্রন্থে হযরত আলী (রা) থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে। —(মাযহারী)

অবশ্য একথা হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া আবশ্যক যে, পরামর্শ শুধু সে সমস্ত ব্যাপারেই সুন্নত, যেগুলোর ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। পক্ষান্তরে যেসব ব্যাপারে পরিষ্কার শরীয়তী হুকুম রয়েছে তাতে কোন পরামর্শের আদৌ প্রয়োজন নেই। বরং এসব ব্যাপারে পরামর্শ করা জায়েযই নয়। উদাহরণত কোন লোক যদি নামায পড়বে কি পড়বে না, যাকাত দেবে কি দেবে না, হজ্জ করবে কি করবে না—এসব ব্যাপারে পরামর্শ করতে চায়, তবে তা জায়েয নয়। এগুলো পরামর্শের বিষয়ই নয়। শরীয়ত অনুযায়ী এগুলো একান্ত ও অলংঘনীয় ফরয। তবে হজ্জে এ বছরই যাবে কি পরবর্তী বছর যাবে, কিংবা পানির জাহাজে করে যাবে, না উড়োজাহাজে যাবে অথবা অন্য কোন পথে যাবে—এসব বিষয় পরামর্শ করা যেতে পারে।

তেমনিভাবে যাকাতের ব্যাপারে এমন পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে যে, তা কোথায়, কোন্ কোন্ লোকের জন্য ব্যয় করবে। কারণ, এসব ব্যাপারই শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐচ্ছিক।

এক হাদীসে স্বয়ং রসূলে করীম (সা) এ বিষয়টির বিশ্লেষণ করেছেন। হযরত আলী (রা) ইরশাদ করেছেন যে, আমি হুযুরে আকরাম (সা)-এর সমীপে নিবেদন করলাম —আপনার পরে (তিরোধানের পরে) যদি আমাদের সামনে এমন কোন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যার প্রকৃষ্ট কোন নির্দেশ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি এবং আপনার কাছ থেকেও সে ব্যাপারে কোন বক্তব্য আমরা শুনিনি, তখন আমরা কি করবো? মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন, "এমন কাজের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যকার বিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও আবিদ লোকদেরকে সমবেত করবে এবং তাঁদের পরামর্শে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে; কারও একক মতে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।"

এই হাদীস শরীফের দ্বারা একটি বিষয় তো এ-ই বোঝা যাচ্ছে যে, পরামর্শ শুধু পার্থিব ব্যাপারে নয়, বরং শরীয়তের যেসব আহকাম সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের

পরিষ্কার কোন নির্দেশ না থাকবে, সে সমস্ত আহকাম সম্পর্কেও পারস্পরিক পরামর্শ করে নেওয়া সুন্নত। এছাড়া আরও একটি বিষয় বোঝা যায় যে, এমন সব লোকের কাছ থেকেই পরামর্শ নেওয়া উচিত যারা উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিচক্ষণতা ও ইবাদত পালনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। ---(আল-খাতীব আররূহ্)

খাতীব বাগদাদী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হুযুরে আকরাম (সা)-এর এ বাণীটিও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا

অর্থাৎ "বুদ্ধিমান লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না ; অন্যথায় অনুতাপ করতে হবে।"

এতদুভয় হাদীসের সমন্বয় করতে গেলে বোঝা যায় যে, পরামর্শ সভার সদস্যদের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। একটি হলো বুদ্ধিমান ও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হলো ইবাদতে পাকা হওয়া। যার সারমর্ম এই যে, তাকে যোগ্যতাসম্পন্ন ও পরহিযগার হতে হবে। আর বিষয়টি যদি শরীয়ত সংক্রান্ত হয়, তাহলে দীনী ব্যাপারে বিচক্ষণতাও অপরিহার্য।

তৃতীয় বিষয় ঃ সাহাবায়ে-কিরামের নিকট থেকে রসূল (সা)-এর পরামর্শের মান ঃ এ আয়াতে মহানবী (সা)-কে সাহাবায়ে-কিরামের সাথে পরামর্শ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, মহানবী (সা) হলেন আল্লাহ্র রসূল এবং ওহীপ্রাপ্ত, কাজেই তাঁর অন্য কারও সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজন? তিনি যে কোন বিষয় ওহীর মাধ্যমে লাভ করতে পারেন। কাজেই কোন কোন ওলামা পরামর্শের এ নির্দেশকে সাহাবায়ে-কিরামের মনস্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ, মহানবী (সা)-র না ছিল পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন, আর না ছিল তাঁর কোন কাজ পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইমাম জাস্সাসের মতে এই মতটি সঠিক নয়। কারণ, একথা যদি জানা থাকে যে, আমাদের পরামর্শের ওপর আমল করা হবে না কিংবা কোন কাজের ব্যাপারে পরামর্শের কোন প্রভাব নেই, তবে এ ধরনের পরামর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংবা মনস্তুষ্টি কোনটাই থাকে না। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, সাধারণ বিষয়ে মহানবী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে কর্মপন্থা সরাসরি নির্ধারণ করে দেওয়া হতো ঠিকই, কিন্তু হিকমত ও রহমতের তাকীদে কোন কোন ব্যাপারে মহানবী (সা)-র মতামত ও বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হতো। এমনি ধরনের ব্যাপারে প্রয়োজন হতো পরামর্শের। আর এসব বিষয় পরামর্শে করার জন্যই হুযুরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মহানবী (সা)-র পরামর্শ সভার বিবরণ থেকেও একথাই প্রতীয়মান হয়।

মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে যখন সাহাবায়ে-কিরামের সাথে পরামর্শ করেন, তখন সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, আমাদেরকে যদি সাগরে ঝাঁপ নিতে নির্দেশ

করেন, তবে আমরা তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়বো। আর আপনি যদি আমাদেরকে 'বারকুল-গামাদ' হেন দূর-দূরান্তের দিকে যাত্রা করতে বলেন, তবে তাতেও আমরা আপনার সাথী হবো। মূসা (আ)-র সাথীদের মত আমরা এ কথা বলবো না যে—"আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে কাফিরদের সাথে লড়াই করুন।" বরং আমরা নিবেদন করবো—"আপনি তশরিফ নিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে থেকে আপনার অগ্রে-পশ্চাতে, ডানে-বাঁয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবো।"

এমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধের সময় পরামর্শ করা হয় যে, মদীনা নগরীর অভ্যন্তর থেকে শত্রুকে প্রতিহত করা হবে, না মদীনার বাইরে গিয়ে? তাতে সাধারণভাবে সাহাবীগণের মত হলো বাইরে বেরিয়ে যাবার পক্ষে। তখন হুযুর (সা) তাই কবুল করে নিলেন। পরিখার যুদ্ধকালে কোন একটি বিশেষ চুক্তির ভিত্তিতে সন্ধি করার বিষয় উপস্থিত হলে হযরত সা'দ ইবনে মা'আয (রা) এবং হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রা) এ চুক্তিকে সমীচীন মনে করতে পারলেন না, তাঁরা বিরোধিতা করলেন। বস্তুত হুযুরে আকরাম (সা)-ও এদের মতই গ্রহণ করলেন। হুদায়বিয়ার কোন একটি ব্যাপারেও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাতে হযরত আবূ বক্কর সিদ্দীক (রা)-এর মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এসব কয়টি বিষয় এমন ছিল যাতে হুযুর (সা)-এর জন্য ওহীর মাধ্যমে বিশেষ কোন দিক সাব্যস্ত করা হয়নি।

সারকথা হলো এই যে নবুয়ত, রিসালত এবং ওহীর অধিকারী হওয়া পরামর্শ গ্রহণের জন্য কোন অন্তরায় নয়। তাছাড়া এমনও নয় যে, এসব পরামর্শ শুধুমাত্র বাহ্যিক ও মনস্তুষ্টির নিমিত্ত হবে; আসল কাজের ব্যাপারে এ-সবের কোন প্রভাবই থাকবে না। বরং বহু ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাদের মতামতকেই মহানবী (সা) নিজের মতের বিপরীতে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এমন কি কোন কোন ব্যাপারে হুযুর (সা)-এর জন্য সরাসরি ওহীর মাধ্যমে কোন বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ না করে পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করার নির্দেশ দানের পেছনে এ তাৎপর্য এবং হিকমতও নিহিত ছিল যে, এতে ভবিষ্যত উম্মতের জন্য যেন রসূলের কাজের মাধ্যমেই একটি সুন্নতের প্রচলন হয়ে যায়। মহানবী (সা) যখন পরামর্শের ব্যাপারে মুক্ত নন, তখন অপর কেউ কেমন করে এ ব্যাপারে মুক্ত বলে দাবী করতে পারে! কাজেই হুযুরে আকরাম (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের মাঝে এ ধরনের ব্যাপারাদিতে পরামর্শ রীতি সর্বদা অব্যাহত রয়েছে, যাতে শরীয়তের কোন স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। তাছাড়া মহানবী (সা)-র পরে সাহাবায়ে-কিরামের মাঝেও এ রীতি অব্যাহতভাবে প্রচলিত রয়েছে। এমনকি পরবর্তীকালে শরীয়তের সে সমস্ত বিধি-বিধান অনুসন্ধান করার ব্যাপারেও পরামর্শের রীতি প্রচলিত থাকে যাতে কোরআন ও হাদীসের কোন প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বিদ্যমান ছিল না। কারণ, হযরত আলী (রা)-র প্রশ্নের উত্তরে মহানবী (সা) এই পন্থাই বাতলে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ বিষয়ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের মান কি হবেঃ উপরে যেমন বলা হয়েছে যে, কোরআন করীমে দু' জায়গায় পরামর্শের ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। তার একটি হলো এ আয়াতে, আর অপরটি হলো সূরা শূরার যে আয়াতে মুসলমানদের

গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই বলে উল্লেখ করা হয়েছে وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ "আর তাদের কার্যাদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।" এতদুভয় জায়গাতেই পরামর্শের সাথে 'আমর' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আর أمر শব্দের বিস্তারিত পর্যালোচনা উপরে করা হয়েছে যে, যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা বা কাজকেই 'আমর' বলা হয়। তাছাড়া বিধি-বিধান বা রাষ্ট্রের অর্থেও এ কাজটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'আমর'-এর প্রথম অর্থই উদ্দেশ্য হোক অথবা দ্বিতীয় অর্থই ব্যবহৃত হোক---যে কোন অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ করে নেওয়া অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়। বিধি-বিধান অর্থ নেওয়া হলে তো কথাই নেই, যদি সাধারণ অর্থেও 'আমর' শব্দের ব্যবহার হয়, তবুও বিধি-বিধান এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ই পরামর্শযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচক্ষণ ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া ইসলামী নেতৃবর্গের একান্ত দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের উল্লিখিত আয়াত এবং রসূল করীম (সা) ও খোলাফায়ে-রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুমের কার্যধারাই এর প্রকৃষ্ট সনদ।

এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো ঐ একটি পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে; বংশগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। অধুনা ইসলামী শিক্ষারই দৌলতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তদুপরি ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যসমূহ জোরে হোক, জবরদস্তিতে হোক এ-দিকেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেকার যুগের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন সমগ্র বিশ্বের উপর বর্তমান তিন বৃহতের স্থলে দুই বৃহতের শাসন বিদ্যমান ছিল। তার একটি হলো কিসরার শাসন আর অপরটি হলো কায়সারের শাসন। এতদুভয়ের বিধি-বিধানই ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসাবে একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এতে এক ব্যক্তি লক্ষ-কোটি বনী-আদমের উপর শাসন করতো, নিজের মেধা ও যোগ্যতার বলে নয়, বরং উত্তরাধিকারের নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে। আর মানুষকে গৃহপালিত জানোয়ারের মর্যাদা দেওয়াকেও মনে করা হতো একান্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান ও ইন'আম। রাষ্ট্রীয় এই মতবাদই দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধুমাত্র গ্রীসে গণতন্ত্রের কিছু নমুনার একটা অসম্পূর্ণ রেখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাও ছিল এতই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ যে, তার উপর কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একান্তই দুরূহ ব্যাপার। সে কারণেই গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে কোন স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি। বরং সে সমস্ত মূলনীতি এরিস্টটলের দর্শনের একটি শাখা হিসাবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের অপ্রাকৃতিক নীতি-পদ্ধতিসমূহ বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ-অপসারণের

বিষয়টি একান্তভাবে জনসাধারণের অধিকারে তুলে দিয়েছে, যে অধিকারকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি এবং বিচক্ষণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পথে আটকে পড়া পৃথিবী ইসলামের শিক্ষারই দৌলতে এই ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতিগ্রাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। আজকের পৃথিবী যাকে গণতন্ত্র নামে অভিহিত করছে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণই হলো এটি।

কিন্তু বর্তমান ধাঁচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ যেহেতু রাজতান্ত্রিক উৎপীড়ন-নিপীড়নেরই প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাও এত অসমঞ্জসভাবে বিকাশ লাভ করেছে যে, জনসাধারণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন বিধানের মুক্ত-মালিকানা দান করেছে, ফলে তাদের মনমস্তিষ্ক আসমান, যমীন ও মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্ট্রাধিকারের কল্পনা থেকেও বিমুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের গণতন্ত্র আল্লাহ্ তা'আলারই দেওয়া গণঅধিকারের উপর আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতাসমূহকে পর্যন্ত মনের উপর কঠিন চাপ এবং ন্যায়ের পরিপন্থী বলে ধারণা করতে শুরু করেছে।

ইসলামী সংবিধান যেভাবে বনী-আদমকে 'কায়সার' ও 'কিসরার' এবং ব্যক্তি শাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনের নিগড় থেকে মুক্ত করেছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেও দেখিয়েছে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথ। কোন দেশের বিধিব্যবস্থা হোক কিংবা জনসাধারণ---সবাইকে একথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার আইনেরই অনুগত। জনসাধারণ এবং গণসংসদের অধিকার, আইন-প্রণয়ন, মনোনয়ন, অপসারণ সবই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার ভেতরে হতে হবে। শাসক বা নেতার নির্বাচনে, পদ ও দফতর বন্টনের ব্যাপারে একদিকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি যেমন পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনিভাবে তাদের আমানতদারী, বিশ্বস্ততারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এমন লোককেই নিজেদের শাসক বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি ইলম ও পরহিযগারী, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে হবেন সর্বোত্তম। তদুপরি এ নেতা নির্বাচন স্বেচ্ছাচারমূলক হবে না, বরং বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সৎ লোকদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হবে। কোরআনে করীমের উল্লিখিত আয়াত এবং রসূলে করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিই তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা) ইরশাদ করেছেন ঃ لا خلافة الا عن مشورة অর্থাৎ পরামর্শকরণ ব্যতীত খিলাফত হতে পারে না। ---(কানযুল-উম্মাল)

আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোন সময় পরামর্শের উর্ধ্বে চলে যায় কিংবা এমন ধরনের লোকের সাথে পরামর্শে প্রবৃত্ত হয়, যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শের যোগ্য নয়. তবে তাকে অপসারিত করা অপরিহার্য।

ذكر ابن عطية ان الشورى من قواعد الشريعة والدين فعزله واجب، هذا مالا خلاف له ٥

অর্থাৎ ইবনে আতিয়্যাহ্ বলেন যে, পরামর্শ করা হলো শরীয়তের মৌলিক নীতি-মালার অন্তর্ভুক্ত। (যে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান, জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকদের পরামর্শ না নেবেন) তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব। আর এটি এমন একটি মাস'আলা যাতে কারো মতবিরোধ নেই। —(আবূ হাইয়ান রচিত 'বাহ্রে-মুহীত')

পরামর্শ অপরিহার্য হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার অধিবাসীবৃন্দের যে সুফল লাভ হবে, তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, রসূলে করীম (সা) পরামর্শকে 'রহমত' বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে 'আদী ও বায়হাকী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য এ পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ্ এই পরামর্শকে আমার উম্মতের জন্য রহমত সাব্যস্ত করেছেন। —(বয়ানুল-কোরআন)

সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে তাঁর রসূলকে প্রতিটি কাজের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে বলে দিতেন, পরামর্শের কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু হুযূরের মাধ্যমে পরামর্শ-রীতির প্রচলন করার সাথেই নিহিত ছিল উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল। কাজেই আল্লাহ্ বহু বিষয় এমন রেখে দিলেন, যাতে সরাসরি কোন পরিষ্কার ওহী নাযিল হয়নি। বরং সেগুলোর ব্যাপারে হুযূরে আকরাম (সা)-কে পরামর্শ করে নেওয়ার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

পঞ্চম বিষয়ঃ পরামর্শে মতবিরোধ হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পন্থাঃ কোন বিষয়ে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কি রাষ্ট্রপ্রধান বাধ্য থাকবেন, না সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক কিংবা সংখ্যালঘিষ্ঠ হোক শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ এবং দেশের অধিকতর স্বার্থের প্রেক্ষিতে যে কোন মত গ্রহণ করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানের থাকবে? কোরআন এবং রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের রীতি অনুযায়ী এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় না যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা নেতা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। বরং কোরআনে করীমের কোন কোন ইঙ্গিত-ইশারা এবং হাদীস ও সাহাবায়ে-কিরামের রীতির পর্যালোচনায়ও একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় মঙ্গল বিবেচনায় যে কোন দিক গ্রহণ করতে পারেন। তা সংখ্যাগুরুর মতানুযায়ী হোক কিংবা সংখ্যালঘুর মতানুযায়ী হোক। অবশ্য আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নিজের আত্মসন্তুষ্টি বা ইতমিনান হাসিল করার উদ্দেশ্যে যেমন অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করবেন, তেমনিভাবে সংখ্যাগুরুর মতৈক্যের বিষয়টিও বিবেচনা করবেন। অনেক সময় এটাও তার আত্মতুষ্টির সহায়ক হতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে রসূলে করীম (সা)-কে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ- فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সেইভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। এতে عزمت শব্দে عزم অর্থাৎ নির্দেশ বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প করাকে শুধুমাত্র মহানবী (সা)-র প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। عزمتم (আযামতুম) বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে-কিরামের সংযুক্ততাও বোঝা যেতে পারতো। এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেওয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য। কোন কোন সময় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত বেশী শক্তিশালী হতো তখন সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমন সব মনীষী উপস্থিত থাকতেন, যাঁরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন গরিষ্ঠ। হুযুরে আকরাম (সা)-ও অনেক সময় 'শায়খাইন' অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগলো যে, উল্লিখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্য নাযিল হয়ে থাকবে। হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে নিজস্ব সনদ অনুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ

عن ابن عباس (رض) فى قوله تعالى "وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ" قال ابو بكر (رض) وعمر رضى الله عنهم - (ابن كثير)

অর্থাৎ "ইবনে আব্বাস বলেন, উল্লিখিত شاورهم আয়াতের সর্বনামের লক্ষ্য হলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)। —(ইবনে কাসীর)

এ প্রসঙ্গে কালবী যে রেওয়ায়েত করেছেন, তা আরও সুস্পষ্ট ঃ

عن ابن عباس رضى الله عنه قال نَزَلَتْ فى ابو بكر وعمر وكانا حواريتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وابوَى المسلمين - (ابن كثير)

অর্থাৎ 'ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা দুজন হযরত রসূলে করীম (সা)-এর বিশেষ সাহাবী, উযীর বা মন্ত্রী আর মুসলমানদের মুরুব্বী ছিলেন। —(ইবনে কাসীর)

হযুরে আকরাম (সা) একবার শায়খাইন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলে ছিলেন ঃ لو اجتمعتما فی مشورة ما خالفتکما

অর্থাৎ "তোমরা দুজন যখন কোন ব্যাপারে একমত হয়ে যাও, তখন আমি তোমাদের বিরোধিতা করি না। —(ইবনেকাসীর)

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এটা তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপন্থী এবং ব্যক্তিশাসনের রীতি। তাছাড়া এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষতির আশংকাও বিদ্যমান।

উত্তর এই যে, ইসলামী আইন পূর্বাহ্নেই এর প্রতি লক্ষ্য করেছে। কারণ, যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীর বানিয়ে দেওয়ার অধিকারই জনসাধারণকে সে দেয়নি। বরং জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, আল্লাহ্-ভীতি ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে যাকে সবচেয়ে ভাল মনে করা হবে, শুধুমাত্র তাকেই নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জনগণের জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে। তবে যে ব্যক্তিকে এ সমস্ত উচ্চতর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে, তার উপর যদি এমন সব দায়িত্ব আরোপ করা হয়, যা অবিশ্বাসী, ফাসিক ও ফাজির ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয়, তবে তা বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়নীতিকে হত্যা করারই নামান্তর এবং যারা কাজের লোক, তাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তরায় সৃষ্টির শামিল হবে।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ প্রতিটি কাজ করার পূর্বে পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার পর আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা ঃ এখানে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ ও চেষ্টা-চরিত্র করার বিধি-বিধান বাতলে দেওয়ার পর হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর, যখন কাজ করার স্থির সংকল্প করে নেওয়া হবে, তখন নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করবে। কারণ, এসব চেষ্টা-চরিত্রকে বাস্তবায়িত করে দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্র হাতে। মানুষ বা তাদের মতামত কিছুই নয়। প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের হাজারো ঘটনায় এসব বিষয়ে অকৃতকার্যতা প্রত্যক্ষ করে থাকে। মওলানা রুমী বলেছেন ঃ

خویش را دیدیم در رسوائ خویش
امتحانِ ما مکن اے شاہ بیش

তাছাড়া فاذا عزمت فتوکل علی الله বাক্যের দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাওয়াক্কুল কিংবা আল্লাহ্র উপর ভরসা করা উপকরণ ও চেষ্টা-চরিত্রকে পরিহার করার নাম নয়। বরং নিকটবর্তী উপকরণ পরিহার করে তাওয়াক্কুল করা নবীর সুন্নত ও কোরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। তবে দূরবর্তী উপকরণ এবং সুদূরের চিন্তা-ভাবনা পেছনে পড়ে থাকা কিংবা শুধুমাত্র উপকরণের উপর নির্ভর করা এবং সেগুলোকেই কারিকা শক্তি বলে মনে করে প্রকৃত কারক থেকে গাফিল হয়ে পড়া নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুলের খেলাফ।

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا كَانَ
لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۚ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾ اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ
اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ
دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾ اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ
قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ۭ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۭ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ۭ هُمْ
لِلْكُفْرِ يَوْمَىِٕذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا
لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا
لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۭ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ
الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ

اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ
اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(১৬০) যদি আল্লাহ্ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্র উপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত। (১৬১) আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। (১৬২) যে লোক আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত, সে কি ঐ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহ্র রোষ অর্জন করেছে? বস্তুত তার ঠিকানা হল দোযখ। আর তা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৬৩) আল্লাহ্র নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের। আর আল্লাহ্ দেখেন যা কিছু তারা করে। (১৬৪) আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (১৬৫) যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী। (১৬৬) আর যেদিন দু'দল সৈন্যের মুকাবিলা হয়েছে, সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহ্র হুকুমেই হয়েছে এবং তা এ জন্য যে, যাতে ঈমানদারদের জানা যায় (১৬৭) এবং তাদেরকে যাতে জানা যায়, যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল, 'এসো আল্লাহ্র রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর।' তারা বলেছিল—আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।' সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুত আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। (১৬৮) তারা হলো সেই সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে তারা নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৬৯) আর যারা আল্লাহ্র রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। (১৭০) আল্লাহ্ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর

যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (১৭১) আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।

যোগসূত্র ঃ ওহুদের ঘটনায় সাময়িক পরাজয় এবং মুসলমানদের পেরেশানির কারণে সাহাবায়ে-কিরামের সান্ত্বনার জন্য হুযুরে আকরাম (সা)-কে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে রসূলে করীম (সা)-এর অসন্তুষ্টির আশংকা দূর হয়েছিল সত্য কিন্তু তাদের মনে এ পরাজয়ের জন্য বড় গ্লানি বিদ্যমান ছিল। সেজন্য আলোচ্য বারটি আয়াতের প্রথমটিতে তাঁদের পরাজয়ের গ্লানি মন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি বদরের দিনে একটি চাদর হারিয়ে গিয়েছিল। তাতে কোন কোন (স্বল্পজ্ঞান মুনাফিক) লোক বলল, হয়তো তা রসূলে করীম (সা) নিয়ে নিয়েছেন। আর এ বিষয়টি প্রকৃত-পক্ষে কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিল আমানতের খেয়ানত। এতে নবী ছিলেন পবিত্র। কাজেই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হযরত রসূলে মকবুল (সা)-এর মহৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্য, আমানতদারী এবং সেই ধারণার ভ্রান্ততা বর্ণনা করে পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং হুযুরে আকরাম (সা)-এর অস্তিত্বকে মহা নিয়ামত এবং তাঁর আবির্ভাবকে মানব জাতির জন্য মহা অনুগ্রহ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

যেহেতু এই পরাজয়ের জন্য মু'মিনদের মনে অত্যন্ত কঠিন গ্লানি বিদ্যমান ছিল যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এহেন বিপদ কেন এবং কোথা থেকে এল। এরই ভিত্তিতে সাহাবায়ে-কিরামের মনে বিস্ময় ও আক্ষেপ হচ্ছিল। তদুপরি মুনাফিকরা বলে বেড়াচ্ছিল যে, এরা যদি বাড়ীতে বসে থাকত, তাহলে তাদেরকে মরতে হত না। এরা তাঁদের শাহাদাতকে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনা বলে সাব্যস্ত করছিল। কাজেই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম আয়াতে অন্য আরেক শিরোনামে এই সাময়িক বিপদ ও কষ্টের কারণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে মুনাফিকদের উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

নবম আয়াতে তাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'বাড়ীতে বসে থাকাই মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায়।' আর দশম, একাদশ ও দ্বাদশতম আয়াতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মহান সাফল্য ও নিত্য জীবন লাভ এবং চিরস্থায়ী নিয়ামত-সমূহের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি মহান পরওয়ারদেগার তোমাদের সহায় থাকেন, তাহলে কেউ তোমাদের সাথে জিততে পারে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তখন তাঁর উপরে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে (এবং তোমাদেরকে জয়ী করে দেবে)? আর যারা ঈমানদার তাদের পক্ষে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরই ভরসা করা উচিত। আর নবীর পক্ষে শোভন নয় যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্‌) খেয়ানত করবেন। অথচ (যে লোক খেয়ানতকারী কিয়ামতেও তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হবে। কারণ,) যে লোক খেয়ানত

করবে, সে তার খেয়ানতকৃত বস্তু কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত করবে (যাতে সমগ্র সৃষ্টি অবহিত হতে পারে এবং সবার সামনে যাতে তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হতে পারে)। অতঃপর (কিয়ামত অনুষ্ঠানের পরে) এই খেয়ানতকারীদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের বদলা (দোযখের মাঝে) পাবে। আর (তাদের) উপর একটুও অন্যায় করা হবে না। (অপরাধের অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না। যা হোক, খেয়ানতকারী তো গযব ও জাহান্নামের যোগ্য হলই আর আম্বিয়া আলায়হিমুস্‌সালাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার কারণে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন হবেন। কাজেই এ দুটি বিষয় একত্রিত হতে পারে না---যেমন, বলা হয়েছে)। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুগত (যেমন, নবী) সে কি ঐ লোকের অনুরূপ হয়ে যাবে, যে লোক আল্লাহ্‌র গযবের অধিকারী হবে এবং যার ঠিকানা হবে দোযখ? (যেমন, খেয়ানতকারী,) আর তা হল নিকৃষ্টতম অবস্থান। (কস্মিনকালেও এতদুভয় সমান হবে না। বরং) আলোচ্য (ন্যায় ও সত্যানুগামী এবং যারা গযবের যোগ্য) ব্যক্তিবর্গ মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে হবে ভিন্ন। (যারা সত্যানুগ তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় ও জান্নাতী আর যারা ধিকৃত তারা দোযখের যোগ্য)। আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভাল করেই দেখেন তাদের কার্যকলাপ-সমূহ (কাজেই তিনি প্রত্যেকের সাথেই যথার্থ ব্যবহার করবেন)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি (বড়ই) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন (মহান) নবী পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত (ও আহ্‌কাম)-সমূহ পাঠ করে করে শোনান এবং (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পঙ্কিলতা থেকে) তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে থাকেন। আর তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) কিতাব ও জ্ঞানের কথা বাতলাতে থাকেন। বস্তুত বিশ্বাসের দিক দিয়ে এরা (তাঁর আবির্ভাবের) পূর্ব থেকে পরিষ্কার ভ্রান্তি (অর্থাৎ) শিরক ও কুফরের মধ্যে (লিপ্ত) ছিল। আর (ওহুদের ময়দানে) যখন তোমরা এমনভাবে হেরে গেলে, যার দ্বিগুণ জিতে গিয়েছিলে (বদরের ময়দানে। কারণ, ওহুদে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন আর বদরে তাঁরা সত্তর জন কাফিরকে হত্যা করেন এবং সত্তর জনকে বন্দী করে নিয়ে আসেন)! তাহলে এমন ক্ষেত্রে কি তোমরা (প্রতিবাদ হিসাবে না হোক বিস্ময় প্রকাশচ্ছলে) এ কথা বলে থাক যে, (মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও) এই (পরাজয়) কোন্ দিক থেকে হলো (অর্থাৎ কেন হলো)? আপনি বলে দিন, এই পরাজয় তোমাদেরই পক্ষ থেকে হয়েছে। (তোমরা যদি মহানবী [সা]-র মতের বিরুদ্ধাচরণ না করতে, তাহলে পরাজয় বরণ করতে না। কারণ, হুযুরের পূর্ণ আনুগত্যের শর্তে বিজয়ের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতাবান। যখন তোমরা আনুগত্য প্রদর্শন করেছ, তখন তিনি তোমাদেরকে নিজ ক্ষমতায় বিজয় দান করেছেন। আবার যখন তোমরা বিরুদ্ধাচরণ করেছ, তখন তিনি স্বীয় ক্ষমতায় তোমাদেরকে পরাজয় দান করেছেন। আর যেদিন (মুসলমান ও কাফিরদের) দুটি (সৈন্য) দল পারস্পরিক (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন) তোমাদের উপর যে বিপদ এসে পড়েছিল, তা আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়েছিল। (এতে বহু হিকমত নিহিত ছিল, যা উপরেও উল্লিখিত হয়েছে)। আর (সে সমস্ত হিকমতের মধ্যে

একটি হল) যাতে মুসলমানদেরও আল্লাহ্ দেখে নেন। (কারণ, বিপদের সময়ই স্বার্থ-পরতা প্রকাশ পায়। যেমন, উপরে উল্লিখিত হয়েছে)। এবং সেসব লোককেও যাতে দেখে নেন, যারা প্রতারণামূলক আচরণ করেছে)। আর (যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন তিন শ' লোক মুসলমানদের সহযোগিতা পরিহার করে চলে গিয়েছিল যেমন—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে) তাদেরকে বলা হয় যে, (যুদ্ধের ময়দানে) চলে এস (তারপর সাহস হলে) আল্লাহ্র পথে লড়াই কর কিংবা (সাহস না হলে) শত্রুকে প্রতিহত কর। (কারণ, ভীড় বেশী দেখে তাদের উপর কিছু প্রভাব পড়বে এবং এভাবে হয়তো সরেও পড়তে পারে)। তারা বলল, আমরা যদি নিয়মানুগ লড়াই দেখতাম, তবে তোমাদের সাথে অবশ্যই এসে শামিল হয়ে যেতাম। (কিন্তু এটা কি কোন লড়াই হলো যে, তারা তোমাদের তুলনায় তিন-চার গুণ বেশী! তদুপরি তাদের কাছে যুদ্ধের উপকরণও রয়েছে বহুগুণ বেশী। কাজেই এমতাবস্থায় লড়াই করা আত্মহত্যারই নামান্তর। একে লড়াই বলা যায় না। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,) এই মুনাফিকরা (যখন এহেন বিশুল্ক উত্তর দিয়েছিল,) সেদিন (প্রকাশ্যত তারা কুফরের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে সে অবস্থার তুলনায় যে, তারা (প্রথমে বাহ্যত) ঈমানের কিছুটা নিকটবর্তী ছিল। (কারণ, পূর্বে যদিও তারা বিশ্বাসের দিক দিয়ে মু'মিন ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সামনে তাদের সমর্থনসূচক কথাবার্তা বলতে থাকত। কিন্তু সেদিন এমনিভাবে চোখ উল্টে গেল যে, তাদের মুখ থেকে প্রকাশ্য বিরোধিতার কথা বেরিয়ে পড়ল। সুতরাং প্রথমে ঈমানের সাথে যে বাহ্যিক নৈকট্য ছিল, তা কুফরীর নৈকট্যে পরিণত হয়ে গেল। আর এই নৈকট্য পূর্ববর্তী নৈকট্য অপেক্ষা বেশী এজন্য যে, তাদের তখনকার সমর্থনসূচক কথাবার্তাগুলো আন্তরিক ছিল না। কাজেই তা তেমন শক্তিপূর্ণও ছিল না। পক্ষান্তরে এই বিরোধিতাপূর্ণ কথা-বার্তাগুলো যেহেতু আন্তরিকও ছিল, সেহেতু এগুলো যথেষ্ট জোরদারও ছিল)। এরা নিজের মুখে এমন সব কথাবার্তা বলে, যা তাদের মনের কথা নয় (অর্থাৎ লড়াই যত সুষ্ঠুই হোক, মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা না করাই হল তাদের মনের কথা)। আর তারা যা কিছু নিজের মনে পোষণ করে আল্লাহ্ সেসব বিষয় খুব ভালভাবেই জানেন (কাজেই তাদের সে কথার ভ্রান্ততাও আল্লাহ্র জানা রয়েছে)। এরা এমন সব লোক (যারা নিজে তো জিহাদে অংশগ্রহণ করেইনি, তদুপরি ঘরে বসে বসে) নিজেদের (স্বগোত্রীয়) ভাইদের সম্পর্কে (যারা শহীদ হয়েছে) বলাবলি করে যে, (এরা) যদি আমাদের কথা মানত (অর্থাৎ আমাদের বারণ করা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত) তবে (খামখা) নিহত হত না। আপনি বলে দিন যে, তাই যদি হবে, নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে রাখ, যদি তোমরা (এ ধারণায়) সত্য হয়ে থাক (যে, মাঠে গেলেই মৃত্যু ঘটে। কারণ, হত্যা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য তো মৃত্যু থেকেই বাঁচা। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন হয়ে যাবে, তখন বসে বসেও মৃত্যু এসে যায়। কাজেই সময় এসে গেলে নিহত হওয়ার ব্যাপার খণ্ডিত হতে পারে না)। আর যারা আল্লাহ্র রাহে (ধর্মের জন্য) নিহত হয়ে গেছে তাদের (সাধারণ মৃত ব্যক্তিদের মত) মৃত বলে ধারণা করো না। বরং তারা (এক অনন্য জীবনধারায়) জীবিত (এবং) স্বীয় পালনকর্তার (দরবারে) নৈকট্যপ্রাপ্ত (অর্থাৎ অতি প্রিয়পাত্র)। তারা রিযিক প্রাপ্তও বটে। আর তারা সে বিষয়ে অত্যন্ত

আনন্দিত যা আল্লাহ্ তা'আলা আপন (কৃপা ও) অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন। (যেমন নৈকট্যের মর্যাদা, জাহিরী ও বাতিনী রিযিক প্রভৃতি)। আর (যেভাবে তাঁরা নিজেদের অবস্থায় আনন্দিত, তেমনিভাবে) যারা এখনও এ পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে; তাঁদের নিকট পৌঁছতে পারেন নি (বরং) তাদের পেছনে পড়ে রয়েছেন, তাঁদের এ অবস্থার জন্যও (যারা শহীদ হয়েছেন) তাঁরা আনন্দিত যে, (যদি তাঁরাও শহীদ হয়ে যান, তবে আমাদেরই মত) তাদের উপরও কোন রকম ভয়ভীতি আরোপিত হবে না এবং তাঁরা (কোন অবস্থায়) দুঃখিত হবেন না। (সারকথা, তাঁরা দ্বিবিধ আনন্দ লাভ করবেন। একটি হল নিজেদের সম্পর্কে আর অপরটি হল নিজেদের সতীর্থদের সম্পর্কে। পরবর্তীতে তাদের এ আনন্দের কারণ বিবৃত হচ্ছে যে,) তারা (নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে আনন্দিত হয়) আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির কারণে (যা তাঁরা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন)। আর (অন্যদের অবস্থা সম্পর্কে আনন্দিত হয়) এজন্য যে, (সেখানে যাবার পর তারা প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন যে,) আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের (কাজের) প্রাপ্য বিনষ্ট করেন না। (কাজেই তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেসব লোক তাঁদের পেছনে রয়ে গেছেন এবং জিহাদ প্রভৃতির মত সৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরাও এমনি ধরনের পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গনীমতের মাল চুরি করা মহাপাপঃ কোন নবীর পক্ষে এমন পাপের সম্ভাব্যতা নেইঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّغُلَّ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনীমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল এই যে, বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের মধ্য থেকে একটি চাদর চুরি হয়ে যায়। কোন কোন লোক বলল, হয়তো সেটি রসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়ে থাকবেন। এসব কথা যারা বলত, তারা যদি মুনাফিক হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব নয়। তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়তো মনে করে থাকবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে غلول বা গনীমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা মহাপাপ হওয়া এবং কিয়ামতের দিন সেজন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা। কারণ, নবীগণ হলেন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত মানুষ।

غلول শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনীমতের মালে খেয়ানত করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর গনীমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত

করা সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশী কঠিন। তার কারণ, গনীমতের মালের সাথে গোটা ইসলামী সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনও কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যর্পণ করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক (সাধারণত) পরিচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনও কোন সময় আল্লাহ্ যদি তওবা করার তওফীক দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই—কোন এক যুদ্ধে এক লোক যখন উলের কিছু অংশ নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল বন্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হল, তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে হুযূর (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হল। তিনি রহমাতুল্ লিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমগ্র সেনাবাহিনীর মাঝে বন্টন করব? কাজেই কিয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হ'য়ো।

'গলূল' তথা গনীমতের মাল চুরি করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন এজন্যই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি করা বস্তু-সামগ্রী তার কাঁধে চাপানো থাকবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, দেখ, কিয়ামতের দিন কারো কাঁধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে (এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনীমতের মালের উট চুরি করেছিল)—এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শাফা'আত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহ্র যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা সবই পৌঁছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না।

আল্লাহ্ রক্ষা করুন! হাশর মাঠের এই লাঞ্ছনা এমনই কঠিন হবে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে এসব ঘটনা ঘটবে, তারা কামনা করবে যে, আমাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, তবু যেন এহেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে বেঁচে যাই।

ওয়াক্ফ ও সরকারী ভাণ্ডারে চুরি করা গলূলেরই পর্যায়ভুক্ত ঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ এবং ওয়াক্ফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার-হাজার মুসলমানের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? এমনিভাবে রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগার (বায়তুল মাল)-এর হুকুমও তাই। কারণ, এতে সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক এতে চুরি করে, সে সবারই অধিকারে চুরি করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ সমস্ত মালেরই কোন একক বা ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না; বরং যারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক থাকে, কাজেই ইদানীং সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশী চুরি ও খেয়ানত

এ সমস্ত মালেই হচ্ছে। পক্ষান্তরে মানুষ এর কঠিন পরিণতি ও ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে একান্ত নিস্পৃহ যে, এতে জাহান্নাম ছাড়াও হাশরের মাঠে রয়েছে চরম লাঞ্ছনা। তদুপরি হুযূর আকরাম (সা)-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত। —(নাউযুবিল্লাহ্!)

মহানবী (সা)-র আগমন সমগ্র মানবতার জন্য সর্বৃহৎ অনুগ্রহ ঃ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই একটি আয়াত সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে। সে আয়াতের তফসীর মা'আরেফুল কোরআনের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এখানে এই আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে ঃ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ রসূলে করীম (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়ে মু'মিনদের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয়টি হল এই যে, কোরআনে করীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী (সা) হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নিয়ামত ও মহা অনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এ আয়াতে শুধুমাত্র মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়েত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলারই অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ উভয় ক্ষেত্রেই এক। তা হল এই যে, যদিও রসূলে মকবুল (সা)-এর অস্তিত্ব মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নিয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কোরআনে করীমও সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়েত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়েত ও নিয়ামতের ফল শুধু মু'মিন-মুত্তাকীরাই উপভোগ করেছে, সেহেতু কোন কোন স্থানে একে তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল রসূলে করীম (সা)-কে মু'মিনদের জন্য কিংবা সমগ্র বিশ্বের জন্য মহা নিয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ হিসাবে বিশ্লেষণ করা।

আধুনিককালের মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতাবিমুখ এবং বস্তুবাদিতার দাসে পরিণত না হত, তবে এ বিষয়টি কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখত না; যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এই মহা অনুগ্রহের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিককালের মানুষ যেহেতু পৃথিবীর জীব-জন্তুসমূহের মধ্যে একটি অতি বিচক্ষণ জীব অপেক্ষা অধিক কিছু রয় নি, কাজেই তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও ইন'আম বলতেও সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে তাদের পেট ও জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ সংগৃহীত হয়। তারা সেগুলোর অস্তিত্বের মূল তাৎপর্য বা তার প্রাণ ও তার ভালমন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। সে কারণেই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রথম একথা বাতলে দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে যে, তাদের

মূল তত্ত্ব শুধু কয়েকটি হাড়গোড় ও চর্ম-মাংসের সমষ্টি নয়, বরং মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য হল সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। যতক্ষণ এ আত্মা তার দেহে বর্তমান রয়েছে, ততক্ষণই সে মানুষ এবং ততক্ষণই তার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে যতই দুর্বল, সামর্থ্যহীন ও মুমূর্ষু হোক না কেন, দেহে আত্মা থাকা পর্যন্ত তার সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেবার কিংবা তার অধিকার ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা কারোরই নেই। পক্ষান্তরে যখনই তার দেহ থেকে এই আত্মা পৃথক হয়ে যায়, তখন সে যত বড় বীর-পাহলোয়ানই হোক না কেন, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই সুগঠিত ও সুসংহত থাক না কেন, সে আর মানুষ থাকে না—নিজের বিষয়-সম্পত্তিতেও আর তার কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

আম্বিয়া (আ) পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্য, যাতে তাদের দেহের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজ-কর্ম মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রতিপন্ন হতে পারে। তারা যেন বিষাক্ত হিংস্র জীব-জানোয়ারের মত অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য নিজেই যেন উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে। আর মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কাজেও মহানবী হযরত রসূলে মকবুল (সা)-এর মর্যাদা অন্যান্য নবী-রসূল অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর মক্কী জীবনে শুধু মানব সমাজের জন্য ক্যাডার গঠনের কাজই সম্পাদন করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে এমন এক সমাজ গঠন করে দিয়েছেন, যার মর্যাদা ফেরেশতাদের চাইতেও ঊর্ধ্বে। সারা দুনিয়া এর পূর্বে আর কখনও এমন ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁদের একেকজন রসূলে করীম (সা)-এর প্রত্যক্ষ মু'জিযার ফসলে প্রতীয়মান হয়েছেন। তাঁদের পরবর্তীদের জন্যও তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি রেখে গেছেন, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হলে সাহাবায়ে-কিরামের অনুরূপ স্থান লাভ করা যেতে পারে। আর যেহেতু এই শিক্ষা সারা বিশ্বেরই জন্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যই অনুগ্রহ স্বরূপ। অবশ্য এর দ্বারা প্রকৃত মু'মিনগণই পরিপূর্ণ উপকার লাভ করেছে।

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের কারণ ঃ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم...

আয়াতের পূর্বেও কয়েক স্থানে এ বিষয়টির আলোচনা এসে গেছে। এখানে পুনরায় অধিকতর তাকীদের সাথে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। কারণ, এ ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে কঠিন গ্লানি বিদ্যমান ছিল। এমনকি কোন কোন সাহাবীর মুখে এ কথাও উচ্চারিত হল যে, أَنَّىٰ هَٰذَا অর্থাৎ এ বিপদ কোথা হতে এল, অথচ আমরা রসূলে করীম (সা)-এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছি।

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আজ তোমাদের উপর যত বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয়েছে, তোমরা ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধকালে তোমাদের প্রতিপক্ষের উপর এর দ্বিগুণ বিপদ চাপিয়েছিলে। তার কারণ, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান

শহীদ হয়েছিলেন সত্তর জন অথচ বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সত্তর জন সরদার তো নিহত হয়েই ছিল, তদুপরি আরো সত্তর জন বন্দী হয়ে মুসলমানদের হাতে এসেছিল। এ বিষয় স্মরণ করিয়ে দেবার একটি উদ্দেশ্য হল এই যে, এই ভেবে যেন মুসলমানদের বর্তমান গ্লানি কিছুটা লাঘব হয়ে যায় যে, যারা দ্বিগুণ বিজয় অর্জন করেছে, তারা যদি একবার অর্ধেক পরাজিত হয়ে যায়, তবে তাতে তেমন দুঃখিত কিংবা বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় ও প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে আয়াতের শেষ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ বাক্যে। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, বিপদাপদ যাই এসেছে আসলে তা শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে আসেনি, বরং তোমাদের নিজেদেরই কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন এসেছে। যেমন, রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নির্দেশ পালনে তোমাদের শিথিল হয়ে যাওয়া।

অতঃপর فَبِإِذْنِ اللَّهِ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যাই কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে, যাতে নিহিত রয়েছে বহু হিকমত ও রহস্য। সেসব রহস্যের কিছু কিছু ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ্ নিঃস্বার্থ মু'মিনগণকেও দেখে নেবেন অর্থাৎ যাতে মু'মিনদের নিঃস্বার্থতা এবং মুনাফিকদের প্রতারণা এমনভাবে প্রকৃষ্ট হয়ে যায়, যাতে যে কোন লোক তা দেখে নিতে পারে। এখানে আল্লাহ্র দেখে নেওয়ার অর্থ হল এই যে, পৃথিবীতে দেখার যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী দেখে নেওয়া। অন্যথায় আল্লাহ্ তো সর্বক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুত এই রহস্যটি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফিকরা সরে দাঁড়িয়েছে, আর নিঃস্বার্থ মু'মিনরা যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন।

এভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এ যুদ্ধে যেসব মুসলমান শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব প্রতিদান দিয়েছেন, অন্যদেরও তার প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا আয়াতে শহীদদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্র রাহে শাহাদত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা ঃ এ আয়াতে শহীদানের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (র) বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও

পার্থক্য রয়েছে। কাজেই হাদীসের রেওয়ায়েতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

এখানে শহীদানের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম ফযীলত স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাঁরা মরেন নি, বরং অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাঁদের মৃত্যুবরণ এবং সমাহিত হওয়াটা একান্তই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বিষয়। তবুও কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদেরকে মৃত না বলার এবং মনে না করার যে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কি? যদি বলা হয় যে, এতে 'বরযখ'-এর জীবন বোঝানো হয়েছে, তবে এ জীবন তো মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সবারই রয়েছে। মৃত্যুর পর তাদের সবার রূহ্ই জীবিত থাকে। আর কবরের সওয়াল-জওয়াবের পর সৎ-মু'মিনদের জন্য সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা এবং বেঈমান কাফিরদের জন্য কবর আযাবের ব্যবস্থার বিষয় তো কোরআন-সুন্নাহ্র দ্বারাই প্রমাণিত। কাজেই বরযখের জীবন যখন সবার জন্যই ব্যাপক, তখন শহীদানের বৈশিষ্ট্য কি রইল?

উত্তর এই যে, কোরআনে-করীমের এই আয়াতেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শহীদরা রিযিক পেয়ে থাকেন। আর রিযিক তারাই পেয়ে থাকে, যারা জীবিত। এতে বোঝা যায়, এই জড় পৃথিবী থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহীদের জন্য স্বর্গীয় রিযিক প্রাপ্তি আরম্ভ হয়ে যায় এবং তখন থেকে তাঁরা এক বিশেষ ধরনের জীবন প্রাপ্ত হন, যা সাধারণ মৃতদের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে। —(কুরতুবী)

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সে বৈশিষ্ট্যসমূহ কেমন এবং সে জীবনই বা কোন্ ধরনের? এর তাৎপর্য একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানতে পারে না এবং জানার কোন প্রয়োজনও নেই। অবশ্য কোন কোন সময় তাদের এই বিশেষ ধরনের জীবনের কিছু লক্ষণ এ পৃথিবীতেই তাদের দেহে প্রকাশ পায়; মাটি তাঁদেরকে খায় না, তাঁদের লাশ বরাবর অবিকৃত রয়ে যায়। —এ ধরনের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। —(কুরতুবী)

এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তাঁদের অনন্ত জীবন লাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদের রিযিক প্রাপ্তি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ আয়াতে যে, তাঁরা সদা-সর্বক্ষণ আনন্দমুখর থাকবেন। যে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ্ তাঁদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হল, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের যেসব উত্তরসূরিকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তাঁরাও পৃথিবীতে থেকে সৎ কাজ ও জিহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে তাঁরাও এখানে এসে এমনি সব নিয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

আর সাদ্দী (র) বর্ণনা করেছেন যে, শহীদের যেসব আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এখন তোমার নিকট আসছেন, তখন তিনি তেমনি আনন্দিত হন, যেমন পৃথিবীতে বহু দূরের কোন বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষাৎ হলে হয়ে থাকে।

এ আয়াতের যে শানে নযুল হযরত আবূ দাউদ (র) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হল এই—রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে-কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন যে, ওহুদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন, তখন আল্লাহ্ তাঁদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীর পালকের ভেতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝরনা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তাঁরা সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহ্র আরশের নিচে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, "আমাদের আত্মীয়-আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশ গ্রহণের) চেষ্টা করে।" তখন আল্লাহ্ বললেন, "তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি।" এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল করা হয়। ---(কুরতুবী)

الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ
لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ
النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ
وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ
لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾
اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

(১৭২) যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহিযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, 'তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।' তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার

কামিয়াবী দানকারী !' (১৭৪) অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অতি বিরাট। (১৭৫) এরা যে রয়েছে, এরাই হল শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্‌ ও রসূলের কথা মেনে নিয়েছে (যখন তাদেরকে কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আহ্‌বান করা হয়, লড়াইয়ের মাঝে) সদ্য যখমী হওয়া সত্ত্বেও, তাদের মাঝে যারা সৎ ও পরহিযগার (প্রকৃতপক্ষে সবাই সে রকম), তাদের জন্য (আখিরাতে) রয়েছে মহা সওয়াব। এরা এমন (নিঃস্বার্থ) লোক যে, (কোন কোন) লোক (অর্থাৎ আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা) তাদের কাছে (এসে) বলল যে, তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা) তোমাদের (মুকাবিলার) জন্য বিরাট সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে তোমাদের আশংকা করা উচিত। তখন এতে (এ সংবাদ) তাদের ঈমান (এর জোশ)-কে আরও বাড়িয়ে দিল এবং (অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একথা) বলে প্রসঙ্গ সমাপ্ত করে দিল যে, (যাবতীয় জটিলতায়) আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলাই যথেষ্ট। আর তিনিই সমস্ত বিষয় সমর্পণ করার জন্য উত্তম। (এই সমর্পণকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল)। সুতরাং এরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনুগ্রহে (অর্থাৎ সওয়াব ও আখিরাতের মুক্তিতে) ধন্য হয়ে ফিরে এল। তাদের কোনই অনিষ্ট হল না। আর এরা (এ ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার) অনুগত রইল (এবং তার ফলে পার্থিব নিয়ামতের দ্বারাও ধন্য হলো)। আর আল্লাহ্‌ বড়ই অনুগ্রহশীল। (হে মুসলমানগণ)! এর চেয়ে অধিক (আশংকাজনক) কোন কিছুই হতে পারে না যে, এই সংবাদদাতা শয়তান (কার্যত) সে নিজের (স্বধর্মীয়) বন্ধুদের ব্যাপারে (তোমাদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করছে। সুতরাং তোমরা কখনও তাদের ভয় করো না এবং শুধুমাত্র আমাকে ভয় করবে, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে নযুল ঃ উপরে গযওয়ায়ে ওহুদের কাহিনীর বর্ণনা ছিল। উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সে যুদ্ধ প্রসঙ্গেই অন্য আরেকটি যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে, যা 'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' নামে খ্যাত। 'হামরাউল আসাদ' হলো মদীনা তাইয়্যেবা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই—মক্কার কাফিররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেওয়াই উচিত ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার

সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের সম্পর্কে এই বলে ভয় ধরিয়ে দেবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুযূর (সা) জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 'হাম্‌রাউল-আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

---(ইবনে জারীর, রূহুল বয়ান)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত রয়েছে যে, ওহুদের দ্বিতীয় দিনে রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় মুজাহিদদের মাঝে ঘোষণা করলেন যে, আমাদেরকে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। কিন্তু এতে শুধুমাত্র সেসব লোকই যেতে পারবে, যারা গতকালকের যুদ্ধে আমাদের সাথে ছিল। এ ঘোষণায় দু'শ মুজাহিদ দাঁড়িয়ে গেলেন।

আর সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরিকীনের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত হলেন, যাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যাঁরা দিনের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা 'হামরাউল-আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সেখানে নু'আয়ম ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে সংবাদ দিল যে, আবূ সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ এবং মদীনাবাসীদের স্বাগত জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত, দুর্বল সাহাবায়ে কিরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম সাহায্যকারী।

এদিকে মুসলমানদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেওয়া হলো, কিন্তু মুসলমানরা তাতে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না। অপরদিকে বনী খোযাআহ্ গোত্রের মা'বাদ ইবনে খোযাআহ নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বন্ধুত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত আবূ সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য আক্ষেপ করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে, তখন সে আবূ সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

এ ঘটনার বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, গযওয়ায়ে ওহুদে আহত হওয়া সত্ত্বেও এবং কঠিন কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও যখন তাদেরকে আরেক জিহাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আহ্বান জানালেন, তখন তাঁরা তার জন্যও তৈরী হয়ে গেলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে যে সব মুসলমানের প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর একটি হল مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে তাঁরাই সাড়া দিয়েছেন যাঁরা ওহুদের যুদ্ধে যখমী হয়েছিলেন। তাঁদের সত্তরজন বীর যোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের শরীরও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তাঁদেরকে আরেক জিহাদের আহ্বান জানানো হলো, অমনি তৈরী হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা বাস্তব ও কার্যকর প্রচেষ্টা ও আত্মবিসর্জনের মহান কীর্তি স্থাপনের সাথে সাথে অনুগ্রহ ও পরহিযগারীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। আর এই সমন্বিত বৈশিষ্ট্যই তাঁদের মহাপ্রতিদান প্রাপ্তির কারণ।

এ আয়াতে مِنْهُمْ (তাদের মধ্য থেকে) সর্বনাম ব্যবহারের কারণে এমন সন্দেহ করা বাঞ্ছনীয় নয় যে, তাঁদের সবাই অনুগ্রহ ও পরহিযগারীর গুণে গুণান্বিত ছিলেন না, বরং তাঁদের মধ্যে কিছু লোক এ গুণের অধিকারী ছিলেন। তার কারণ এখানে مِنْ শব্দটি বিশিষ্টতা বিধানের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এ আয়াতের প্রাথমিক বাক্যগুলোই সাক্ষ্য বহন করছে—বলা হয়েছে— الَّذِينَ اسْتَجَابُوا (অর্থাৎ যারা আহ্বানে সাড়া দিয়েছে) এই সাড়া দান ও আনুগত্য প্রকাশ ইহ্সান ও তাকওয়ার অবর্তমানে সম্ভব হতে পারে না। কাজেই অধিকাংশ মুফাসসিরিন এ ক্ষেত্রে مِنْ বাক্যটিকে বিশ্লেষণমূলক বলে সাব্যস্ত করেছেন, যার সারমর্ম হল এই যে, এ সমস্ত লোক যারা ইহ্সান ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত, তাঁদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

নিঃস্বার্থতার অবর্তমানে কৃতকার্যতার জন্য শুধু চেষ্টা-চরিত্র ও আত্মনিবেদনই যথেষ্ট নয়ঃ এই বিশেষ বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়টি জানা গেল যে, কোন কাজ যতই সৎ হোক না কেন এবং তার জন্য কেউ যতই সচেষ্ট ও নিবেদিতপ্রাণ হোক না কেন, আল্লাহ্র দরবারে সে তখনই প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য হতে পারে, যখন তাতে ইহ্সান ও তাকওয়ার সমন্বয় ঘটবে। সারকথা হচ্ছে যে, সে কাজটি একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশে হবে। অন্যথায় আত্মনিবেদন ও বীরত্বের বিষয় কাফিরদের মধ্যেও কম নেই।

রসূল (সা)-এর নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই নির্দেশ ঃ এ ঘটনায় মুশরিকীনদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ যে রসূলুল্লাহ্ (সা) দিয়েছিলেন, সে কথা কোরআনের কোন আয়াতে উল্লেখ নেই। কিন্তু এ আয়াতে যখন তাঁদের আনুগত্যের প্রশংসা করা হয়, তখন সে নির্দেশকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল উভয়ের দিকে সম্পর্কিত করে اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ বলা হয়েছে। এতে অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে নির্দেশ দান করেছেন, তা আল্লাহ্রও নির্দেশ বটে, তা আল্লাহ্র কিতাবে উল্লেখ থাক আর নাই থাক।

যেসব ধর্মহীন লোক হাদীসকে অস্বীকার করে এবং রসূল (সা)-কে শুধুমাত্র একজন দূত বলে অভিহিত করে (মাআযাল্লাহ্) তাদের উপলব্ধির জন্যও বাক্যটি যথেষ্ট হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশকে আল্লাহ্ নিজেরই নির্দেশ বলে সাব্যস্ত করেছেন ! এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ও স্বীয় দূরদর্শিতার আলোকে অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু নির্দেশ দানের অধিকারী এবং তাঁর দেয়া এ হুকুমের মর্যাদাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া নির্দেশাবলীরই অনুরূপ।

ইহ্সানের সংজ্ঞা ঃ হাদীসে জিবরীলে হুযূর আকরাম (সা) ইহ্সানের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তোমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। আর এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি করতে না পার, তবে অন্তত এমন অবস্থা তো হবে যে, তিনি তোমাদের দেখছেন।

তাকওয়া বা পরহিযগারীর সংজ্ঞা ঃ তাকওয়ার সংজ্ঞা বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা হলো সেটি, যা হযরত উমর (রা)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) দিয়েছেন। হযরত উমর (রা) প্রশ্ন করেছিলেন, তাকওয়া কি ? হযরত উবাই ইবনে কা'আব বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনি কি কখনও এমন পথ অতিক্রম করেছেন, যা পরিপূর্ণভাবে কন্টকাকীর্ণ ? হযরত উমর (রা) বললেন, কয়েকবারই এমন হয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) বললেন, এমন ক্ষেত্রে আপনি কি করেছেন? হযরত উমর (রা) বললেন, আঁচল গুটিয়ে একান্ত সাবধানতার সাথে চলেছি। হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) বললেন, ব্যস, 'তাকওয়া' এরই নাম ! এ দুনিয়া হল একটি কাঁটাবন ; পাপের কাঁটায় পরিপূর্ণ। কাজেই দুনিয়ায় এমনভাবে চলা এবং জীবন যাপন করা উচিত, যাতে পাপের কাঁটায় আঁচল ফেসে না যায়। এরই নাম তাকওয়া, যা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। হযরত আবুদ্-দারদা (রা) প্রায়ই এই কবিতা পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন ঃ

يَقُوْلُ الْمَرْءُ فَائِدَتِىْ وَمَالِىْ
وَتَقْوَى اللهِ اَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

অর্থাৎ মানুষ নিজের পার্থিব লাভ এবং সম্পদের পেছনে পড়ে থাকে, অথচ তাকওয়াই হল সবচেয়ে উত্তম পুঁজি।

দ্বিতীয় আয়াতে এই জিহাদে অগ্রসরমান সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অধিকতর প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا -

অর্থাৎ এরা সেসব মহাত্মা ব্যক্তি, যখন তাঁদেরকে লোকেরা বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিরাট সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে ; তাদের ভয় কর। যুদ্ধের সংকল্প নিও না। তখন এ সংবাদ তাঁদের ঈমানী উদ্দীপনাকে আরও বাড়িয়ে দিল। তার কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যকে যখন তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তখন প্রথম দিন থেকেই অনুভব করছিলেন যে, যে পথে চলতে আরম্ভ করেছি, তা একান্তই শংকাপূর্ণ। প্রতি পদে পদে জটিলতা ও বাধার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের পথ রোধ করা হবে এবং আমাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে মিটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলবে। কাজেই যখন তাঁরা এহেন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা প্রত্যক্ষ করতেন তখন তাঁদের ঈমানের শক্তি পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যেত এবং সর্বাপেক্ষা প্রাণপণ ও আত্মনিবেদনের মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করতেন।

বলা বাহুল্য, এ সকল সাহাবায়ে-কিরামের ঈমান ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই ছিল একান্ত পরিপূর্ণ। কাজেই এ দু'আয়াতে ঈমানের বৃদ্ধি বলতে ঈমানের গুণ ও ফলাফলের বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিতে প্রস্তুত সাহাবায়ে কিরামের এ অবস্থানটিও এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সফরের সারা পথে তাঁরা আবৃত্তি করছিলেন ঃ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম সিদ্ধিদাতা।'

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্র উপর রসূলে করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের চাইতে অধিক তাওয়াক্কুল তো দুনিয়ার অন্য কারো মধ্যে থাকতেই পারে না, কিন্তু তাঁদের তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা এমন ছিল না যে, বাহ্যিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি পরিহার করে বসে থাকতেন এবং বলতেন যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট ; তিনি বসিয়ে বসিয়েই আমাদের বিজয় দান করবেন। কিন্তু তা নয়। বরং তিনি সাহাবায়ে-কিরামকে সমবেত করলেন, আহত মানুষের মনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত

করলেন, জিহাদের জন্য তাদেরকে তৈরী করলেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। বস্তুত নিজের আয়ত্তে যত রকম ব্যবস্থা ছিল, সেসবই তিনি করলেন এবং তারপর বললেন, "আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এটাই হল সেই সঠিক ও যথার্থ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, যার শিক্ষা কোরআনে দেওয়া হয়েছে। আর রসূলে করীম (সা)-ও এরই উপর আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। তাছাড়া বাহ্যিক ও পার্থিব উপকরণসমূহও আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগ্রহের দান। এগুলোকে বর্জন করা তাঁর অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। তদুপরি স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা রসূলে করীম (সা)-এর সুন্নত নয়। অবশ্য যদি কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তখন তাকে মনে করা হবে অপারক, মা'যুর। তা' না হলে যথার্থ বিষয় হল ঃ—برتوكل زانوئے اشتربه بند

রসূলে করীম (সা) স্বয়ং কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এ আয়াত সম্পর্কেই পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দু'ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। এই মীমাংসাটি যে লোকের বিরুদ্ধে গেল তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তা শুনলেন এবং একথা বলতে বলতে চলে যেতে লাগলেন ঃ—حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ হুযূর (সা) বললেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আস। তারপর বললেন ঃ

ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فاذا غلبك امر فقل حسبى الله ونعم الوكيل -

অর্থাৎ আল্লাহ্ হাত-পা ভেঙে বসে থাকা পছন্দ করেন না। বরং তোমাদের উচিত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর নরম হয়ে যাওয়া এবং 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কারক' বলে ঘোষণা করা।

তৃতীয় আয়াতে ঐসব সাহাবায়ে-কিরামের জিহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ -

"এরা আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তারা একটুও অসন্তুষ্ট হলো না; আর তারা হল আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত।"

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে তিনটি নিয়ামত দান করেছেন। প্রথম নিয়ামত হল এই যে, কাফিরদের মনে তাঁদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, এতে তারা পালিয়ে গেল।

ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নিয়ামতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নিয়ামত' শব্দেই উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় নিয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তাঁরা যে লাভবান হয়েছিলেন, তাকেই বলা হয়েছে 'ফযল'।

তৃতীয় নিয়ামতটি হলো আল্লাহ্র রেযামন্দী বা সন্তুষ্টি লাভ, যা সমস্ত নিয়ামতের উর্ধ্বে এবং যা এই জিহাদে তাঁদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কোরআনে করীম حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আয়াতে যেসব লাভ ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছে, তা শুধুমাত্র সাহাবায়ে-কিরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং যে কেউ পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা সহকারে এর জপ করবে, সেই এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে।

'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' পাঠের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ওলামা ও মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা ও স্থির বিশ্বাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ করে কোন দোয়া করা হলে আল্লাহ্ তা প্রত্যাখ্যান করেন না। দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' পাঠ করা পরীক্ষিত।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের ভীত করার উদ্দেশ্যে মুশরিকদের প্রত্যাবর্তনের যে সংবাদটি দিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সে ছিল শয়তান। সে তোমাদেরকে স্বীয় সহযোগী বা স্বধর্মীয় কাফিরদের ভয় দেখাতে চায়। তাহলে আসল ইবারতে যেন يُخَوِّفُ-এর একটি কর্ম উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ—يُخَوِّفُكُمْ আর দ্বিতীয় কর্ম أَوْلِيَاءَهُ উল্লিখিত রয়েছে। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ এ ধরনের সংবাদে মুসলমানদের আদৌ ভয় করা উচিত নয়। অবশ্য আমাকে ভয় করতে থাকা কর্তব্য অর্থাৎ আমার আনুগত্যের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে গিয়ে প্রত্যেক মু'মিনেরই ভয় করা কর্তব্য। বস্তুত আল্লাহ্র রহমত থাকলে কোনই ক্ষতি সাধিত হতে পারে না।

আল্লাহ্র ভয় অর্থ ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা মুসলমানদের উপর তিনি ফরয করে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে। বলা হয়েছে يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ—কিন্তু কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, কান্নাকাটি আর অশ্রুপাতের নামই আল্লাহ্র ভয় নয়, বরং সে লোকই খোদাভীরু, যে এমন প্রত্যেকটি বিষয় পরিহার করে, যাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হাজারো আশংকা বিদ্যমান।

হযরত আবূ আলী দাক্কাক (র) বলেন, আবূ বকর ইবনে কাওয়াফ একবার অসুস্থ ছিলেন। আমি তাকে দেখতে গেলাম। আমাকে দেখে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থতা দান করবেন। তিনি বলতে

লাগলেন, তুমি কি মনে করেছ, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি? তা নয়। মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে আমার ভয় যে, সেখানে না কোন আযাবের সম্মুখীন হতে হয়। —(কুরতুবী)

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ
شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ
خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧٨﴾

(১৭৬) আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন তোমাদেরকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। আখিরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহ্র ইচ্ছা। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১৭৭) যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১৭৮) কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-জনক শাস্তি।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কৃতঘ্নতা ও অকল্যাণকামিতার উল্লেখ ছিল। বর্তমান আলোচ্য আয়াতগুলোতে হুযূর (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, আপনি কাফিরদের আচরণে দুঃখিত কিংবা মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। তারা কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। শেষ আয়াতে এ ধারণার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুনিয়ার এসব কাফিরদের প্রচুর উন্নতি সাধন করতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় তাদেরকে অভিশপ্ত এবং লাঞ্ছিত কেমন করে মনে করা যাবে!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনার জন্য তারা চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত, যারা তাড়াহুড়া করে

কুফরের (কথায়) পড়ে যায়, যথা (মুনাফিকগণ মুসলমানদের অবস্থা সামান্য খারাপ দেখলেই খোলাখুলি কুফরের কথা বলতে আরম্ভ করে। যেমন উল্লিখিত ঘটনায় প্রতীয়মান হয়েছে)। নিশ্চয়ই সে সমস্ত লোক আল্লাহ্ তা'আলার (তথা ধর্মের) সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না। (কাজেই আপনার এ ব্যাপারে দুঃখিত হওয়া উচিত নয় যে, তাদের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণে দীনের কোন রকম ক্ষতি সাধিত হয়ে যাবে। আর আপনার যদি এই কাফিরদের জন্য দুঃখ হয় যে, এরা কেন এভাবে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তবুও আপনি দুঃখ করবেন না। কারণ, (সৃষ্টিগতভাবেই) আল্লাহ্ তাই মঞ্জুর করে নিয়েছেন যে, আখিরাতে তাদের কোনই অংশ দেবেন না। অতএব, তাদের দ্বারা কোন সহযোগিতার আশা করা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে দুঃখ তখনই হয়, যখন আশা জড়িত থাকে। আর (তাদের জন্য শুধু আখিরাতের নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিতই নয়, বরং) তাদের জন্য রয়েছে মহা-আযাব। (আর এরা যেমন দীনে ইসলামের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না, তেমনিভাবে) নিশ্চয়ই যত লোক ঈমান (পরিহার করে)-এর স্থলে কুফরী গ্রহণ করে রেখেছে (তা তারা মুনাফিক হোক কিংবা প্রকাশ্য কাফির হয়ে থাক, কাছের হোক অথবা দূরের হোক,) তারা আল্লাহ্ তা'আলার (দীনের) সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না। বস্তুত তাদের (পূর্ববর্তী লোকদের মতই) বেদনাদায়ক শাস্তি হবে। আর যারা কুফরী করছে, তারা যেন কস্মিনকালেও এমন চিন্তা না করে যে, তাদের (আযাব থেকে) আমার অবকাশ দান তাদের জন্য (তেমন) উত্তম (ও কল্যাণকর। তা অবশ্য নয়, বরং) আমি এ জন্য অবকাশ দান করছি (যাতে বয়োবৃদ্ধির কারণে) তাদের পাপে অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়। (এবং যাতে তারা একবারে সম্পূর্ণ শাস্তি প্রাপ্ত হয়)। আর (দুনিয়াতে যদি শাস্তি না হয়ে থাকে, তাতে কি হবে, আখিরাতে তো) তাদের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি হবেই।

কাফিরদের পার্থিব ভোগ-বিলাসও প্রকৃতপক্ষে আযাবেরই পরিপূর্ণতা ঃ এ ক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাফিরদের অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফিররা নির্দোষ। কারণ আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাফিরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ-বিলাসে যেন মুসলমানরা পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয়, এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেসবই ছিল নরকাঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا অর্থাৎ কাফিরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটা কিস্তি, যা আখিরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ
الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ
تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

(১৭৯) না-পাককে পাক থেকে পৃথক করে দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ এমন নন যে, ঈমানদারদের সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের গায়েবের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় রসূলদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর রসূলদের উপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন কর। বস্তুত তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহিযগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

যোগসূত্রঃ পূর্ববর্তী আয়াতে এ সন্দেহের উত্তর ছিল যে, কাফিররা যদি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গযবের অধিকারী ও অভিশপ্ত হয়ে থাকে, তবে দুনিয়াতে তারা ধন-সম্পদ ও বিলাস বৈভব প্রাপ্ত হবে কেন? আলোচ্য আয়াতে তারই বিপরীতে এই সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যে সমস্ত মু'মিন ও মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রিয়, তাদের উপর বিপদাপদ ও কষ্ট আপতিত হয় কেন? অথচ নৈকট্য ও প্রীতির কারণ তো আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ ঈমানদারদের সে অবস্থায় রাখতে চান না, যাতে তোমরা রয়েছ (অর্থাৎ কুফর ও ঈমান, ন্যায় ও অন্যায় এবং মু'মিন ও মুনাফিকের মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া পার্থিব নিয়ামতরাজির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য ও বিশেষত্ব নেই। বরং মুসলমানদের উপর বিপদাপদ পতিত হতে থাকা তখন পর্যন্ত অপরিহার্য) যতক্ষণ না নাপাক (মুনাফিকগণ)-কে পাক পবিত্র (নিঃস্বার্থ মুসলমানদের) থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। (বস্তুত এই পৃথকীকরণ দুঃখ-কষ্ট ও জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হতে পারে। আর যদি কারও মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মু'মিন ও কাফির এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকল্পে কি শুধুমাত্র বিপদাপদ আরোপ করেই পার্থক্য প্রকাশ করা অপরিহার্য? আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমেও ঘোষণা করতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি নিঃস্বার্থ মু'মিন এবং অমুক মুনাফিক। আর অমুক বিষয় হালাল এবং অমুক বিষয়টি হালাল নয়। এর উত্তর এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (হিকমতের তাকীদে) এমন সব গায়েবী বিষয়ে (তোমাদের

সরাসরি পরীক্ষা সম্পর্কে) অবগত করতে চান না। তবে যাদেরকে (তিনি) স্বয়ং এভাবে অবগত করতে চান আর (এসব লোক) হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর। (সরাসরি গায়েবী বিষয়ে অবহিত করার উদ্দেশ্যে দুর্ঘটনাও) তাদেরকে বেছে নেয়। (আর তোমরা যেহেতু পয়গম্বর নও, কাজেই এ ধরনের বিষয়ে তোমাদের অবহিত করা যায় না। অবশ্য এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যাতে তাদের নিঃস্বার্থতা ও মুনাফিকী আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। যখন একথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, পৃথিবীতে কাফিরদের উপর আযাব নাযিল না হয়ে বরং বিলাস-বৈভব প্রাপ্ত হওয়া এবং মুসলমানদের উপর কোন কোন বিপদাপদ আসাটা একান্তই হিকমতের তাকীদ। এসব বিষয় কারও নৈকট্য লাভ কিংবা অভিশপ্ত হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না)। সুতরাং এখন (আর) তোমরা ঈমানের পছন্দনীয় হওয়া আর কুফরী পছন্দনীয় না হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করো না। বরং আল্লাহ্ এবং সমস্ত রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ফেল। আর তোমরা যদি ঈমান আন এবং (কুফর ও পাপ থেকে) পরহিযগারী অবলম্বন কর, তবে তোমরা বিরাট প্রতিদান পাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ওহীর পরিবর্তে কার্যকর পদ্ধতিতে মু'মিন ও মুনাফিকের পার্থক্য বিধানের তাৎপর্য ঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিঃস্বার্থ মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এমন জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে বাস্তব ও কার্যকরভাবে মুনাফিকের প্রতারণা প্রকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এ পার্থক্য বিধান যদিও ওহীর মাধ্যমে মুনাফিকদের নামোল্লেখ করেও করা যেতে পারত, কিন্তু হিকমতের তাকাদা তা নয়। আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ হিকমত তিনিই জানেন। তবে এখানে একটি হিকমত এটাও হতে পারে যে, মুসলমানদের যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হত যে, অমুক ব্যক্তি মুনাফিক, তাহলে তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তার সাথে আচার-আচরণে সতর্কতার ব্যাপারে এমন কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকত না, যা মুনাফিকরাও সমর্থন করতে পারত। তখন তারা বলত যে তোমরা ভুল বলছ। আমরা প্রকৃতই মুসলমান।

পক্ষান্তরে বিপদাপদ ও জটিলতা আরোপের মাধ্যমে যে বাস্তব ও কার্যকর পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে, তাতে মুনাফিকরা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছে; তাদের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে! এখন আর তাদের এ দাবী করার সুযোগ থাকেনি যে, তারাও নিঃস্বার্থ মু'মিন।

এভাবে মুনাফিকী প্রকাশিত হয়ে পড়ায় একটি ফায়দা এও হয়েছে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় মানসিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক মেলামেশা যদি বিদ্যমান থাকত, তবুও তা ক্ষতিকর হত।

গায়েবী ব্যাপারে কাউকে অবহিত করে দেওয়া হলে তা গায়েব থাকে না ঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা গায়েবী ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে যে কাউকে অবহিত করেন না। অবশ্য নিজের নবী-রসূল নির্বাচিত করে, তাদেরকেই গায়েবী ব্যাপারে অবহিত করেছেন। এতে এমন সন্দেহ করা উচিত নয় যে, তাই যদি

হয়, তবে নবীগণও তো ইলমে গায়েবের অংশীদার এবং আলিমে-গায়েব। কারণ, ইলমে গায়েব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্তার সাথে সংযুক্ত, কোনও সৃষ্টিকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। আর তা হল দুটি শর্তসাপেক্ষে। (এক) সে ইলমকে হতে হবে ইলমে যাতী, যা অপর কারও মাধ্যমে আগত বা শেখানো নয়। (দুই) সে ইলমকে সমগ্র বিশ্বজগৎ ও ভূত-ভবিষ্যতের উপর পরিব্যাপ্ত হতে হবে, যাতে কোন একটি অনু-পরমাণু পর্যন্ত গোপন থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী-রসূল-দের যে সমস্ত গায়েবী বিষয় অবহিত করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে ইল্‌মে গায়েব নয়, বরং গায়েবী বিষয়ের সংবাদ যা নবী-রসূলদের দেওয়া হয়েছে। কোরআনে করীমও একে কয়েক স্থানে أَنْبَاءِ الْغَيْبِ (তথা গায়েবের সংবাদ বা অবগতি) শব্দে বিশ্লেষণ করেছে। বলা হয়েছে ঃ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (অর্থাৎ সেগুলো ছিল গায়েবী সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে)।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَنَقُولُ ذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ
حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن
قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝١٨٤ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝١٨٥ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝١٨٦

(১৮০) আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে—তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের চরম স্বত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জানেন। (১৮১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা আমি লিখে রাখব, অতঃপর বলব, 'আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব।' (১৮২) এ হল তারই প্রতিফল, যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ! বস্তুত আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (১৮৩) সেই সমস্ত লোক যারা বলে যে, আল্লাহ্ আমাদের এমন কোন রসূলের উপর বিশ্বাস না করতে বলে রেখেছেন যতক্ষণ না তারা আমাদের নিকট এমন কুরবানী নিয়ে আসবেন, যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে।' তুমি তাদের বলে দাও, "তোমাদের মধ্যে আমার পূর্বে বহু রসূল নিদর্শনসমূহ সহ এবং তোমরা যা আব্দার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাঁদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।" (১৮৪) তাছাড়া এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যারা নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (১৮৫) প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। (১৮৬) অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে-কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং পরহিযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যোগসূত্র ঃ সূরা আলে-ইমরানের প্রারম্ভে ইহুদীদের বদঅভ্যাস ও দুষ্কর্মের যে আলোচনা চলছিল এখান থেকে পুনরায় সে আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর অধিকাংশই এই বিষয় সম্পর্কিত। তবে মাঝখানে রসূলে করীম (সা) ও মুসলমানদের প্রতি সান্ত্বনা ও উপদেশমূলক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

এসব লোকেরা যেন কস্মিনকালেও এমন ধারণা না করে যারা (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) সে সমস্ত সামগ্রীতে (অর্থাৎ তা ব্যয় করার ব্যাপারে) কার্পণ্য করে যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন। এ বিষয়টি তাদের জন্য তেমন কল্যাণকর হবে না (কস্মিনকালেও)। বরং এটা হবে তাদের জন্য অত্যন্ত অশুভ। (কারণ, এর পরিণতি হবে এই যে,) কিয়ামতের দিন তাদের গলায় (এই ধন-সম্পদকে সাপ বানিয়ে) বেড়ি পরানো হবে, যাতে তারা কার্পণ্য করেছিল। আর (কার্পণ্য করাটা এমনিতেও বোকামি। কারণ, শেষ পর্যন্ত যখন সবাই মৃত্যুবরণ করবে, তখন) আসমান-যমীন (এবং এর মাঝে যত সৃষ্টি রয়েছে সে সবই) আল্লাহ্ তা'আলার থেকে যাবে। (কিন্তু তখন এ সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ্র হয়ে যাওয়ায় তোমাদের কোনই সওয়াব হবে না। কারণ, তা তোমরা স্বেচ্ছায় দান করনি। পক্ষান্তরে সবই যখন আল্লাহ্ তা'আলার হয়ে যাবে, তখন এখনই সেগুলো স্বেচ্ছায় দিয়ে দেওয়াই হলো বুদ্ধিমত্তার কাজ, যাতে সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়) আর আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন (কাজেই যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ্র জন্যই ব্যয় কর)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেই (উদ্ধত) লোকদের কথা শুনে নিয়েছেন, যারা (উপহাসছলে) বলেছেন যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ হচ্ছেন মুফলিস-ফকীর আর আমরা হলাম সম্পদশালী (আমীর)। আর (এটুকু শুনেই শেষ নয়, বরং) আমি তাদের কথিত বক্তব্যকে (তাদের আমলনামায়) লিখে রেখে দেব এবং (তেমনিভাবে তাদের আমলনামায় লেখা হবে) তাদের (দ্বারা) অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার বিষয়টিও। আর আমি (তাদের প্রতি শাস্তি আরোপ করার সময় চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে) বলব, (এবার ধর) আগুনের আযাব আস্বাদন কর। (আর তাদেরকে আত্মিকভাবে যাতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একথাও বলা হবে যে,) এ (আযাব) হচ্ছে সেই সব (কুফরী) কার্যকলাপের জন্য যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছ। আর একথা সপ্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা কারো প্রতি অন্যায়কারী নন।

তারা (ইহুদীরা) এমন লোক যে, (সম্পূর্ণ মিছামিছিভাবে) বলে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের (পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের মাধ্যমে) নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন আমরা (পয়গম্বরীর দাবীদার) কারো প্রতি বিশ্বাস না করি (যে, তারা পয়গম্বর), যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার (বিশেষ) নযর-নিয়ায সংক্রান্ত নিদর্শনমূলক মু'জিযা উপস্থাপন না করে (আর তা হল এই) যে, সে সমস্ত (নযর-নিয়ায)-গুলোকে কোন (আসমানী) আগুন এসে গ্রাস করে নেয়। (পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের এমন মু'জিযা ছিল

যে, কোন প্রাণী অথবা নিষ্প্রাণ বস্তু আল্লাহ্‌র নামে নির্ধারিত করে তাকে কোন মাঠে কিংবা পাহাড়ের উপর রেখে দেওয়া হতো। তখন গায়েব থেকে আগুন এসে দেখা দিত এবং সে বস্তুটিকে জ্বালিয়ে দিত। এটাই ছিল সদকাসমূহের কবুল হওয়ার লক্ষণ। তার অর্থ আপনি এমন বিশেষ ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করেন নি। কাজেই আমরা আপনার উপর ঈমান আনছি না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর উত্তর শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলছেন যে,) আপনি বলে দিন, নিঃসন্দেহে আমার পূর্বে বহু নবী-রসূল বহু দলীল-প্রমাণ (মু'জিযা প্রভৃতি) নিয়ে এসেছিলেন এবং স্বয়ং এ মু'জিযাও (এনেছিলেন) যা তোমরা বলছ। অতএব, তোমরা কেন তাঁদেরকে হত্যা করেছিলে যদি তোমরা (এ ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাক? কাজেই এ সমস্ত (কাফির) লোক যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে (দুঃখ করবেন না। তার কারণ,) আপনার পূর্বে আগত বহু পয়গম্বরকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অথচ তাঁরাও মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন। আর (নিয়ে এসেছিলেন) ছোট ছোট সহীফা এবং প্রকৃষ্ট কিতাব (কাফিরদের অভ্যাসই যখন নবী-রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তখন আর আপনার তাতে দুঃখ কিসের)।

(তোমাদের মধ্যে) প্রত্যেক প্রাণ (সম্পন্ন)-কে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং (মৃত্যুর পর) তোমাদের (ভালমন্দের) পরিপূর্ণ ফলাফল কিয়ামতের দিনেই তোমরা প্রাপ্ত হবে। (পার্থিব জীবনে যদি কাফিরদের উপর কোন শাস্তি আপতিত নাও হয়, তাতে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পক্ষে আনন্দিত হওয়ার কিংবা সত্য বলে যারা বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অতঃপর এই ফলাফলের বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে) কাজেই যে লোক দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে সে লোকই যথার্থ সফলকাম। (তেমনিভাবে যারা জান্নাত থেকে পৃথক থাকবে এবং দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে. তারাই হবে অকৃতকার্য)। তাছাড়া পার্থিব জীবন তো কিছুই নয়, শুধুমাত্র (এমন একটা বিষয় যেন), ধোঁকার সওদা। (যার প্রকাশ্য আড়ম্বর জৌলুস দেখে খরিদদাররা ফেঁসে যায়। তারপর যখন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন অনুতাপ করে। এমনিভাবে দুনিয়ার বাহ্যিক জৌলুসাড়ম্বরে ধোঁকা খেয়ে আখিরাতের ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়া উচিত নয়)।

(এখনই কি!) অবশ্য পরবর্তীতে আরো পরীক্ষা করা হবে---সম্পদের (ক্ষতির) মাধ্যমে এবং প্রাণের (ক্ষতির) মাধ্যমে। আর পরবর্তীতে অবশ্যই শুনবে তাদের কাছ থেকেও অনেক কষ্টদায়ক কথা যাদেরকে তোমাদের পূর্বে আসমানী কিতাব দান করা হয়েছিল (অর্থাৎ আহ্‌লে-কিতাবদের কাছ থেকে)। এবং তাদের কাছ থেকে, যারা মুশরিক। আর যদি (এ সব ক্ষেত্রে) তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে পরহিযগারী অবলম্বন কর তাহলে (তা তোমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলকর হবে। কারণ), এটি (অর্থাৎ সবর ও পরহিযগারী) অবশ্যকরণীয় নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত সাতটি আয়াতের প্রথম আয়াতে কার্পণ্যের নিন্দাবাদ এবং তার উপর অভিসম্পাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কার্পণ্যের সংজ্ঞা এবং সে জন্য শাস্তি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ঃ 'বোখল' বা কার্পণ্যের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হল---'যা আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা ব্যয় না করা।' এ কারণেই কার্পণ্য বা বোখ্‌ল হারাম এবং এজন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সব ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব, তাতে ব্যয় না করা হারাম—কার্পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্যই বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্পণ্য বা বোখ্‌ল হারাম নয়। তবে অনুত্তম।

'বোখ্‌ল' বা কার্পণ্য অর্থেই আরও একটি শব্দ হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হল شُحّ-এর সংজ্ঞা হলো এই যে, যে ব্যয় নিজের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল, তা ব্যয় না করা। তদুপরি সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে লোভের বশবর্তী হওয়া। এটি কার্পণ্য অপেক্ষাও অধিক অপরাধ। সে কারণেই রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لايجتمع شح وايمان فى قلب رجل مسلم ابدا -

অর্থাৎ 'শুহ্‌' এবং 'ঈমান' কোন মুসলমানের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। ---(কুরতুবী)

কার্পণ্যের যে শাস্তি এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে---যে বস্তু ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হয়েছে, তা কিয়ামতের দিন গলবেড়ি বানিয়ে সে লোকের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে---এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রসূলে করীম (সা)-এর ইরশাদ রয়েছে ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোককে আল্লাহ্‌ কোন সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন সে সম্পদকে একটি কঠিন বিষাক্ত সাপে পরিণত করে তার গলায় গলবেড়ি বানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সে সাপ তাকে পেচিয়ে ধরবে এবং বলবে---আমি তোমার ধন, আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ আয়াতটি পাঠ করেন। ---(কুরতুবী, নাসাঈ থেকে)

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী (সা) যখন কোরআনে হাকীম থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইহুদীরা বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর। সেজন্যই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। বলা বাহুল্য, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোটেই নয়। কিন্তু হুযূরে আকরাম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই হয়ত বলেছিল যে, কোরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌ ফকীর ও পরমুখাপেক্ষী! তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার দরুন তার কোন উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশ তাঁর নিজের কোন লাভের জন্য নয়, বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও আখিরাতের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোন কোন

ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 'আল্লাহ্‌কে ঋণদান' শিরোনামে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথা বোঝা যায় যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অপরিহার্য ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদানও আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহারে কস্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইহুদীদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কোরআনে করীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের ঔদ্ধত্য ও হুযূরে আকরাম (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ এবং তার প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথায় আল্লাহ্‌র জন্য লেখার কোনই প্রয়োজন নেই।

অতঃপর ইহুদীদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরও একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কুফরী ও পাপের ব্যাপারে মনে প্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ ঃ এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনের লক্ষ্য হলো মহানবী (সা) ও মদীনাবাসী ইহুদীবর্গ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হল হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) ও যাকারিয়া (আ)-এর সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইহুদীদের উপর আরোপ করা হল কেমন করে ? তার কারণ এই যে, মদীনার ইহুদীরাও তাদের পূর্ববর্তী ইহুদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে বলেছেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। রসূলে করীম (সা)-এর এক বাণীতে এ বিষয়ের অধিকতর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, যমীনের উপর যখন কোন পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যে লোক সেখানে উপস্থিত থাকে এবং সে পাপের প্রতিবাদ করে আর সে কাজকে মন্দ জ্ঞান করে, তখন সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাদের পাপের অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও তাদের কৃত পাপের প্রতি সমর্থন দান করে, তাকে অংশীদার বলেই গণ্য করা হবে।

এ আয়াতের শেষাংশে এবং তৃতীয় আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের দোযখে নিক্ষেপ করে বলা হবে, এবার আগুনে জ্বলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটা কোন অন্যায় আচরণ নয়।

চতুর্থ আয়াতে ইহুদীদের অপবাদ ও মিথ্যারোপের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

আর তা হল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপকল্পে এই ছল উদ্ভাবন করে যে, পূর্ববর্তী নবীদের সদকার বস্তু-সামগ্রী কোন মাঠে কিংবা পাহাড়ে রেখে দেওয়ার নিয়ম ছিল, তখন আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা কবূল হওয়ার লক্ষণ। রসূলে করীম (সা) এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে আগুনের গ্রাসে পরিণত করার পরিবর্তে তা মুসলমান গরীব-দুঃখীদের দিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের রীতির সাথে এ রীতিটির কোন মিল ছিল না, সেহেতু একে মুশরিকরা বাহানা বানিয়ে নিল যে, যদি আপনি নবীই হতেন, তাহলে আপনিও এমন মু'জিযা প্রাপ্ত হতেন, যাতে আকাশ থেকে আগুন এসে সদকার বস্তু-সামগ্রীকে গ্রাস করে ফেলত। অধিকন্তু তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহ্র প্রতিও অপবাদ আরোপ করেছে যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছেন যে, আমরা যেন এমন কোন লোকের প্রতি ঈমান না আনি, যার দ্বারা আকাশ থেকে আগুন এসে সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে জ্বালিয়ে দেওয়ার মু'জিযা অনুষ্ঠিত হবে না।

ইহুদীদের এ দাবী যেহেতু আদৌ প্রমাণভিত্তিক ছিল না যে, আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কাজেই তার কোন উত্তর দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন। তাদের নিজেদের বক্তব্যের দ্বারাই তাদেরকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যদি এ দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তবে পূর্ববর্তী যে সব নবী-রসূল তোমাদের কথামত এই মু'জিযাও দেখিয়েছিলেন, তখন তোমাদের কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি ঈমান আনা, কিন্তু তোমরা তাদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, বরং তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করে দিয়েছ। তা কেমন করে করলে?

এখানে এমন সন্দেহ করা যায় না যে, ইহুদীদের এ দাবী যদিও সর্বৈব ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু যদি মহানবী (সা)-র মাধ্যমে এ মু'জিযা প্রকাশিত হত, তবে হয়তো তারা ঈমান আনত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, তারা শুধুমাত্র বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশতই এসব কথা বলছে। কথামত মু'জিযা প্রকাশিত হলেও তারা ঈমান গ্রহণ করত না।

পঞ্চম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মিথ্যাবাদের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। তার কারণ, এমনি ধরনের আচরণ সব নবী-রসূলের সাথেই হয়ে এসেছে।

আখিরাতের চিন্তা যাবতীয় দুঃখ-বেদনার প্রতিকার এবং সমস্ত সংশয়ের উত্তর ঃ ষষ্ঠ আয়াতে এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, যদি কখনও কোথাও কাফিররা বিজয়ীও হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে মুসলমানরা যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধর্ম, কোন মতাবলম্বী কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব দুঃখ-কষ্ট বা আরাম-আয়েশ উভয়টিই কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কোন জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে

পারে না। তাছাড়া পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ নাও হয়, মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং মৃত্যুর পরবর্তী চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে ?

دوران بقا چو بار صحرا بگزشت - تلخی وخوشی وزشت وزیبا بگزشت

এজন্যই এ আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখিরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা প্রাথমিক পর্যায়ে হোক---যেমন, সৎকর্মশীল আবিদদের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে---অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক---যেমন, পাপী মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলমানই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে ওঠে, তবে সেটা একান্তই ধোঁকা। সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে "দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।" তার কারণ এই যে, সাধারণত এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে আখিরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখিরাতের সঞ্চয়।

সবর দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার ঃ সপ্তম আয়াতটি নাযিল হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে, যার মোটামুটি আলোচনা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কোরআন-করীমে যখন مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াতটি নাযিল হয় এবং যাতে অত্যন্ত সালঙ্কার বর্ণনা-ভঙ্গিতে সদকা ও খয়রাতকে আল্লাহ্‌কে করয দেওয়া বলে অভিহিত করা হয় আর সে বর্ণনায় ইঙ্গিত করা হয় যে, যাই কিছু এখানে দান করবে, আখিরাতে তার প্রতিদান তেমনি নিশ্চিত---যেন অন্যের ঋণ পরিশোধ করা হয়।

একথা শুনে কোন এক মূর্খ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদী বলল---ان الله فقير ونحن اغنياء (অর্থাৎ আল্লাহ্ ফকীর আর আমরা হলাম আমীর)। এতে হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সেই ইহুদীকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ইহুদী এসে রসূলে করীম (সা)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করল। তারই প্রেক্ষিতে নাযিল হল।.....

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ.....

এতে মুসলমানদের বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দীনের জন্য জান-মালের কুরবানী দিতে হবে এবং কাফির, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের কটূক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হল তাদের পক্ষে উত্তম। তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ
فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ۝ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّ
يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ
الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(১৮৭) আর আল্লাহ্ যখন আহলে-কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনাবেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচাকেনা। (১৮৮) তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার কাছ থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৮৯) আর আল্লাহ্র জন্যই হল আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন ইহুদীদের অপকর্ম ও অভ্যাসসমূহের আলোচনা ছিল, তেমনি আলোচ্য প্রথম আয়াতেও তাদের একটি অপকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হল, প্রতিজ্ঞা লংঘন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আহ্লে-কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত বিধি-বিধান তওরাত গ্রন্থে এসেছে, তারা তা সাধারণভাবে প্রচার করবে এবং কোন নির্দেশ বা বিধানকেই আত্মস্বার্থে গোপন করবে না। কিন্তু আহলে-কিতাবরা এ প্রতিজ্ঞা লংঘন করেছে। বিধি-বিধান